জঙ্গলগড

উৎসর্গ

শ্রীমান হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু

১. ২. ৬৪

১১৬১ হিজরীর বর্ষার প্রারম্ভ। আষাঢ় মাস। ইংরিজী ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস। মুর্শিদাবাদে ৭২ বৎসরের বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দী খাঁ মারাঠাদের বাংলা থেকে তাড়িয়ে কটক পর্যন্ত জয় করে মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেই অসুখে পড়েছিলেন। কিন্তু তিন মাস পর অসুখ থেকে সেরে উঠেই সংবাদ পেলেন উড়িষ্যা আবার মীর হবিবের সাহায্যে মারাঠারা দখল করেছে। নিজেকে ধিক্কার দিলেন তিনি। ধিক্কার দিলেন—একটা প্রায় ভিক্ষুক শ্রেণীর লোভীকে বসিয়ে এসেছিলেন উড়িষ্যার নায়েবের গদীতে। তিনি জানতেন, কিন্তু তাঁর যে এ ছাড়া আর উপায়ও ছিল না। কোন চিন্তাশীল ওমরাহ কি আমীর এ গদীতে বসতে চান নি। কারণ বর্গীদের অত্যাচারে তখন উত্তরে দিল্লী পর্যন্ত পূর্বে বাংলা পর্যন্ত অশান্তির আর শেষ ছিল না। তার উপর উড়িষ্যা মারাঠা রাজ্য এবং সুবা বাংলার প্রান্তসীমা, আজ এ দখল করে কাল ও দখল করে। কাজেই এ উড়িষ্যার গদীতে কোন চিন্তাশীল ওমরাহ বসার চেয়ে সামান্য জীবন যাপন করাকেও নিরাপদ মনে করেছিলেন। কিন্তু রাজা দুর্লভরামের পল্টনের এই মুসলমান সামান্য মনসবদার শেখ আবদুস শোভান—সে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়িয়ে বলেছিল —'জনাব আলি, মুলুকের মালিক, এই গরীব বান্দার শির জামিন, আর ভরসা দিনদুনিয়ার মালিকের। গোলাম এই দায় পুরতে রাজী।' অগত্যা পাঁচ হাজার আফগান পল্টন তারই তাঁবে রেখে আলিবর্দী সঙ্গে সঙ্গে কটক ত্যাগ করেছিলেন। কারণ সামনে আসন্ন বর্ষা। তাঁর পল্টনের সিপাহিরা একেবারে থ'কে গেছে। তারা যে পরিশ্রম করেছে সে তাদের চেয়েও তিনি বেশি জানেন। তাঁর নিজের কথা তিনি ভাবেন না। বর্ষার সময় বর্গীদের মুলুকে একেবারে সামনে থাকাটা নিরাপদ মনে করেন নি তিনি, ফিরে এসেছিলেন।

বর্গী হাঙ্গামার আগে পাটনায় ছ মাস থাকা তাঁর অভ্যাস হয়েছিল। পাটনায় নাতি সিরাজুদ্দৌলাকে নায়েব করে রাজা জানকীরামকে দেওয়ান করে মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন গত অগ্রহায়ণে। মারাঠারা তখন বাংলায় ঢুকেছে। জানোজী কাটোয়ায় তাঁবু গেড়ে বসে আছে, সঙ্গে তার মীর হবিব। একটা সাক্ষাৎ শয়তান। পারস্যের সিরাজ থেকে ভাগ্যান্বেষী মীর হবিব হিন্দোস্তানে এসে প্রথমে হুগলীতে গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে ফিরি করে বেড়াত, ব্যবসার বস্তুর কোন কিছু ঠিক ছিল না। আজ হীরা জহরৎ মুক্তা নিয়ে বেড়াত, কাল মসলিন মলমলের বোঝা পিঠে ফেলে ফিরত। যেটা সে মহাজনের কাছে বলে করে ধারে পেত তাই নিয়ে বের হত। তা থেকেই তার জীবিকা নির্বাহ হত। লিখতে জানে না, পড়তে জানে না—আছে শুধু আশ্চর্য মিষ্ট মুখ ও কৌতুক পারজমতা, তার সঙ্গে কুটিল বুদ্ধি। শয়তানের মত কুটিল বুদ্ধি। আর বলতে পারে খাসা ফারসী বয়েৎ, তা তার অনেক মুখস্থ। তারই জোরে বড় আমীর মহলে তার ঢুকবার সুবিধা হয়েছিল। এবং সুজাউদ্দীনের জামাই হুগলীর ফৌজদার রোস্তম জং-এর পারিষদ হয়ে নোকরি পেয়েছিল। রোস্তম জং হুগলী থেকে ঢাকা গেল নায়েব হয়ে। মীর হবিব গেল তার পরামর্শদাতা ও পারিষদ হয়ে। মানুষের নসীবের চাকা যখন ঘোরে এবং তখন যদি উঁচু ডালের পর উঁচু ডাল বা উঁচু ধাপের পর উঁচু ধাপগুলিকে আঁকড়ে আঁকড়ে যেতে পারে তবে তার উন্নতির সীমা থাকে না। মীর হবিব রোস্তম জং-এর

উন্নতি করে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও অর্থ সঞ্চয় করেছিল প্রচুর। বিশেষ করে ত্রিপুরার রাজার কাছ থেকে সে কয়েক লক্ষ টাকা ঘুষ খেয়ে আরও উন্নতি করে নিয়েছিল। তারপর ঢাকা থেকে রোস্তম জং-এর সঙ্গে এল উড়িষ্যায়। উড়িষ্যায় সে নায়েব হয়েছিল। নবাব আলিবর্দী যখন মুর্শিদাবাদ দখল করে রোস্তম জং-এর বিদ্রোহ দমন করতে উড়িষ্যায় যান তখন রোস্তম জং পালিয়ে গেলে সে আলিবর্দীকে আশ্রয় করেছিল—তার চাতুর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে চাকরি দিয়েছিলেন। আলিবর্দী নিজে বিচক্ষণ চতুর—চতুর লোক ভালবাসতেন। তবে চোখে চোখে রেখেছিলেন।

প্রথম বর্গী হাঙ্গামার সময় ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে যখন যুদ্ধ করছেন আলিবর্দী, তখন মীর হবিব নবাবের সঙ্গে। বর্ধমানে ঘটল বিপর্যয়। আলিবর্দী কোনমতে আত্মরক্ষা করে লড়াই দিতে দিতে এসে ঢুকলেন মুর্শিদাবাদে। হবিব বন্দী হল মারাঠাদের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক সুবিধাবাদী যোগ দিলে মারাঠাদের সঙ্গে। উড়িষ্যা থেকে বাংলা পর্যন্ত পথঘাট সব তার নখদর্পণে। নবাবী শক্তি তার জানা; এবং ফৌজের নাড়ীনক্ষত্র তার মুখস্থ। উড়িষ্যা মেদিনীপুরের সমস্ত রাজা জমিদারের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। এই রাজারা বিচিত্র চরিত্র। আজ নবাবের পক্ষে, কাল বর্গীর পক্ষে। মীর হবিব তাদের নিয়ে খেলা করছে। এইসব মূলধন নিয়ে মারাঠাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সে খেল খেলে আসছে। বাংলার সর্বনাশ করছে। আজ আট বৎসর সে বাংলাদেশের নসীবের আসমানে শনি নক্ষত্রের মত দৃষ্টি দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বেড়াচ্ছে। শৃগালের মত ধূর্ত। নেকড়ের মত ক্ষুধার্ত। বাঘের মত তার রক্তের তৃষ্ণা। আবার শশকের মত সে বনেজঙ্গলে লাফ দিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কটক থেকে আলিবর্দী খাঁ বর্ষার কথা ভেবে তাঁর পল্টনের অবস্থা বিবেচনা করেই তাড়াতাড়ি ফিরেছিলেন। ওই উল্লুক অপদার্থ আবদুস শোভানকেই উড়িষ্যার নায়েবীতে বসিয়ে চলে এসেছিলেন। ঠিক সাত দিনের মধ্যেই ধূর্ত শিয়াল চিতাবাঘের চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছিল। অর্থাৎ মীর হবিব এসেছিল বর্গী নিয়ে। শোভান লড়াই দিয়ে আহত হয়ে পালিয়েছে। চরের খবর—শোভান এখন ডাকাতি করছে। উড়িষ্যার জঙ্গলে তার বাসা। ওদিকে মীর হবিব বালেশ্বরে মারাঠা শক্তিকে নতুন বাংলা অভিযানের জন্য সমবেত করছে। মোহন সিং এসেছে মারাঠা ফৌজ নিয়ে। মুস্তাফা খাঁর ছেলে মুর্তজা তার পাঠান পল্টন নিয়ে যোগ দিয়েছে। আলিবর্দী তাঁর আয়োজনে ব্যস্ত হয়েছেন। বাংলাদেশে লোকের মুখ শুকিয়েছে। আবার বর্গী আসছে। অনেক লোক ভাবছে দেশ ছেড়ে পালাবে। কিন্তু পালাবেই বা কোথায়, গোটা হিন্দুস্থানে বর্গী কোথায় নেই। আসে তারা কালবৈশাখীর ঝড়ের মত। দেখতে দেখতে কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়। ঝড় ওঠে, বিদ্যুৎ চমকায়, বাজ পড়ে, শিলাবৃষ্টি হয়। ঘরের চাল উড়ে যায়, গাছ ভাঙে, পাতা ছিঁড়ে আকাশময় ওড়ে। নিরাশ্রয় মানুষ বাজে পুড়ে মরে, শিলার আঘাতে জখম হয়ে মরে, বৃষ্টিতে ভিজে থরথর করে কাঁপে—বর্গীর হাঙ্গামাও ঠিক তাই।

এরই মধ্যে মেদিনীপুর অঞ্চলে মানুষ ব্যস্ত-ত্রস্ত বেশী। বিশেষ করে জমিদার রাজারা। এই অঞ্চলটিতে—বাঁকুড়া, মেদিনীপুর অঞ্চলে জমিদার রাজার সংখ্যা অনেক। সে বহুকাল থেকে।

কর্ণগড়, ঝাড়গ্রাম, মহিষাদল, নয়াগড়, নয়াবাসান, হিজলী, ময়না, নয়াগ্রাম, কিয়ারচান্দ; বাঁকুড়ায় বিষ্ণুপুর রাজ প্রভৃতি নিয়ে এ অঞ্চলটি জমিদার জায়গীরদারদেরই রাজত্ব। নবাবের শাসন এখানে ঠিক কোনকালেই কায়েম নয়। সেই পাঠান আমল থেকে মোগল পাঠানের আধিপত্যের যুদ্ধের লীলাভূমি এবং প্রাচীনকাল থেকে উড়িষ্যা এবং বাংলার সীমান্ত হিসাবে এই অঞ্চলটি সামন্তদের দ্বারাই শাসিত হয়ে আসছে। নবাবের শক্তি যখন থাকে, দেশে শান্তি বিরাজ করে এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয় যখন থাকে না তখন নবাব রাজাদের কাছে কর পেয়ে থাকেন, কিন্তু শান্তি না থাকলে পান না। তখন তিনি এদের সীমান্ত রক্ষার জন্য সাহায্য পেলেই সন্তুষ্ট থাকেন। সামন্তেরা, নিজেদের রাজ্য বা জায়গীরের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন। নিজেদের সৈন্য, নিজেদের সেনাপতি, নিজেদের বিচার, নিজেদের কোতোয়ালী—সব নিজেদের। জমির চেয়ে জঙ্গল বেশী। বিরাট ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল এখানেই। সে জঙ্গল মেদিনীপুরের সমস্ত পশ্চিম অংশটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এবং বাংলার সীমান্ত পার হয়ে উড়িষ্যার উত্তর-পশ্চিম ও বিহারের দক্ষিণ-পূর্বের মধ্য দিয়ে মধ্যভারতের পৌরাণিক দণ্ডকারণ্য নৈমিষারণ্যের সঙ্গে মিশে গেছে। এরই মধ্য দিয়ে বর্ধমান হুগলী আরামবাগ হয়ে বাদশাহী সড়ক চলে গেছে। ওদিকে বিহার অঞ্চল থেকে সড়ক এসে মিশেছে। আবার চলে গেছে মধ্যভারত অভিমুখে উত্তর-পশ্চিম উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে। অন্যটি চলে গেছে প্রাচীন তাম্রলিপ্তি—আধুনিক তমলুক অভিমুখে। আবার একটি সড়ক চলে গেছে উড়িষ্যার পূর্বভাগে ঢুকে নীলমাধব জগন্নাথদেবের অধিষ্ঠানভূমি পুরী পর্যন্ত। অন্যদিকে কটক পর্যন্ত। দক্ষিণভাগে সমুদ্র। পুবভাগে সমুদ্র। পশ্চিমভাগে সব অরণ্যভূমি। চাষের জমি কম। সাধারণ হিন্দুগৃহস্থেরা চাষ করে, গ্রামের আশেপাশে জমি। কতকাংশ লাল মাটি ও কাঁকরে ভরা রাঢ়ের মাটি। কতকাংশ কালো মাটি। চাষীরা চাষ করে কিন্তু খুব বেশি নয়। কারণ সামন্তে সামন্তে বিবাদ লেগেই আছে। তার উপর আজ তিনশো বছর ধরে চলে এসেছে মোগল আর পাঠানের লড়াই। কয়েকটি নবাব উপাধিধারী পাঠান জমিদারও রয়েছে। তাদের সঙ্গে ছত্রি জমিদারদের বিরোধ বাধে নানান কারণে। কখনও কন্যা দাবি করে। কখনও বলে মন্দিরের চূড়া বেশি উঁচু হয়েছে, খাটাও। ভাঙো।

এ ছাড়া আছে পাইকদের উপদ্রব। পাইকরা এইসব সামন্তদের পাইক। এ দেশের আদিম অধিবাসী। যুগ যুগ ধরে এইসব যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে প্রয়োজনে সামন্তদের দলভুক্ত হয়ে যুদ্ধ করে এসেছে; যুদ্ধবিগ্রহ না থাকার জন্য নিরুৎসাহ এবং ক্লান্তি বোধ করলে শান্ত কৃষকদের গ্রাম লুঠ করে এসেছে। অন্য সময়ে এইসব জঙ্গল মহলে বাঘ ভালুক নেকড়েদের সঙ্গে লড়াই করেছে। চাষ এরা করে না। অরণ্যের মধ্যেই বাস; অরণ্যের মধ্যেই ঘোরাফেরা। পাইকদের ব্যবহার রূঢ়, এদের চুয়াড় বলে থাকে। এ ছাড়া উত্তর অঞ্চলে আছে বাগ্দী। এরাও রণনিপুণ। সামরিক জাতির মত উগ্রস্বভাব তখন। বাঁকুড়ায় আছে বাউরি-বাগ্দী ডোম। রাজা লাউসেনের ছিল ডোম বাহিনী—সেনাপতি ছিল কালু সর্দার। বিষ্ণুপুরের রাজার ছিল বাগ্দী বাহিনী, তারা দলমাদল কামান নিয়ে লড়াই করেছে। লড়াই এরা কখনও কখনও এই সব ছত্রিরাজাদের সঙ্গেও করেছে। ছত্রিরাজাদের রাজ্যেও ডাকাতি করেছে। উপদ্রব করেছে। সেই প্রথম যুগে এদের সঙ্গে যুদ্ধ করেই রাজ্য স্থাপন করেছিল ক্ষত্রিয়েরা।

ক্ষত্রিয়েরা এদের বশ মানিয়ে বর্বর যুদ্ধের বদলে উন্নত ধরনের যুদ্ধ শিখিয়ে শক্তিশালী সৈন্য-দলে পরিণত করেছিলেন। এমনি একটি দল, বাগ্দী পাইক সেনাদল নিয়ে গভীর অরণ্যে বাস করত দলুই সর্দার—দলপৎ সিং।

দলুই সর্দার ক্ষত্রিয়। এককালের রাজবংশধর। শোলাঙ্কী রাজপুতরাজার বংশের সন্তান। কিন্তু অবস্থাবৈগুণ্যে, স্বাধীনতা এবং জীবনরক্ষার জন্য আজ অরণ্যচারী। কয়েক পুরুষ ধরে এইভাবে বনে বাস করে বিচিত্র ধরনের মানুষে পরিণত হয়েছে।

দলুই সর্দার শোলাঙ্কী রাজপুত। অর্থাৎ অগ্নিকুলের রাজপুত। অগ্নিবংশ, সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশের মতই পবিত্র। পুরাণে আছে দৈত্যদের অত্যাচারে মুনি-ঋষিদের যাগযজ্ঞ বন্ধ হয়ে গেলে স্বয়ং মহাদেব যজ্ঞ করে তাতে আহুতি দিতেই চারজন ক্ষত্রিয় বীর আবির্ভূত হয়েছিল। প্রমার প্রতিহার শোলাঙ্কী (চালুক্য) আর চৌহান। তাঁরা দৈত্যদের অত্যাচার নিবারণ করেছিলেন। শোলাঙ্কী বা চালুক্য বংশ একদিন ভারতবর্ষে প্রবলপ্রতাপ ছিল।

চালুক্য বংশের শুরু দ্বারকায় রাজা ছিলেন, গুজরাট ছিল তাঁর রাজ্য। গুজরাটে শোলাঙ্কীদের বিপর্যয় ঘটল পাঠান সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর সময়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অগ্নিবংশীয় বীরেরা পরাধীন হয়ে গুজরাটে বাস করতে চান নি। তাঁরা স্বাধীনতাকে মাথায় করে দেশ ছেড়েছিলেন, বলতে গেলে নিরুদ্দেশে। ভারতের নানান দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন নূতন স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করবার জন্য। একদল এসেছিলেন বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্তভূমে। মেদিনীপুর জেলায়। এখানে কেদারেশ্বর মহাদেব ছিলেন মাটির তলায়। স্বপ্ন পেয়ে তাঁরা মহাদেবকে এবং উষ্ণ প্রস্রবণ সিদ্ধকুণ্ড আবিষ্কার করে রাজ্য স্থাপন করেন। এই ভূমির নাম তাঁরাই দিয়েছিলেন 'কেদার কুণ্ড'। রাজা ছিলেন মহাবীর মহারাজ বীরসিংহ। রাজধানীর নাম হয়েছিল বীরসিংহপুর।

তখন এখানকার বাগ্দীরা ডাকাতের দল বেঁধে রাজার রাজ্যে উপদ্রব শুরু করেছিল। ক্ষত্রিয়দের উচ্ছেদ করবার ইচ্ছেই বোধ হয় ছিল তাদের। কিন্তু মহারাজা বীরসিং তাদের পরাজিত করে সাতশো জন দুর্ধর্ষ ডাকাতের প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন। তারপর সাতশো মুণ্ড আর সাতশো ধড় দিয়ে পাশাপাশি দুটো স্তূপ তৈরী করে মাটির পাহাড় তৈরী করিয়েছিলেন মুণ্ড-মরাই ও গর্দা-মরাই। এর ফলে বাকী বাগ্দীরা তাঁদের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। রাজপুতেরাও তাদের যুদ্ধশিক্ষা দিয়ে করে তুলেছিল সত্যকারের সৈনিক।

ভাগ্যের দোষে অদৃষ্টের চক্রান্তে যখন মন্দ সময় আসে তখন তাকে রোধ করা বোধ হয় মানুষের অসাধ্য। তা ছাড়া কলিকাল। এই কালে সারা হিন্দুজাতির অদৃষ্টে মন্দ সময় এসেছিল। নইলে যে মুসলমানের কাছে গুজরাটের রাজ্য হারিয়ে ধর্ম এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শোলাঙ্কীরা এসে কেদার কুণ্ডে রাজ্য স্থাপন করে নিশ্চিন্তে বসবাস করছিল, সেখানেও একদিন আবার কেন এল মুসলমানের হানা? গৌড়ের সুলতান মহম্মদ ইলিয়াস শাহ উড়িষ্যা বিজয়ের পথে কেদার কুণ্ড আক্রমণ করলেন। সে যুদ্ধ হয়েছিল প্রবল প্রচণ্ড যুদ্ধ। রাজপুতানার মরুবিজয়ী ক্ষাত্রবীর্য আগুনের মত জ্বলে উঠতে চেয়েছিল। কিন্তু সংখ্যা যুদ্ধে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। গৌড়ের সুলতান মহম্মদ ইলিয়াস শাহের বিশাল বাহিনীর কাছে মুষ্টিমেয় শোলাঙ্কী

রাজপুতের বীর্য বহ্নিবীর্য হলেও কতক্ষণ জলবে ? সঙ্গে বাগ্দী সৈন্য অবশ্য ছিল। কিন্তু রাজত্ব ক্ষুদ্র, তার বাহিনীও ছোট, সুলতানের সৈন্যবাহিনীর শক্তি ধুলোঝড়ের মত বয়ে গিয়ে ধুলো চাপা দিল বহ্নিবীর্যকে, আগুন নিভে যেতে বাধ্য হল। তারপর শুরু হল নিধন-পর্ব। সুলতানের সেনাপতি কঠিন আক্রোশে শোলাঙ্কী রাজপুতদের হত্যা করতে হুকুম দিলেন। এ বহ্নিবীজ রাখা চলবে না। এ আবার কোনদিন জলে উঠে সর্বনাশ করবে। নারী শিশু বৃদ্ধ সব হত্যা কর। যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তারা বাঁচতে পারে। যুদ্ধে সবল শক্তিমান যারা তারা সকলেই প্রাণ দিয়েছিল, বাকী যারা ছিল তারা ওই বৃদ্ধ শিশু আর নারী।

বৃদ্ধেরা পরামর্শ করলেন—কি করবেন ? শাস্ত্রে আপদ্ধর্মের বিধান আছে। সেই বিধান অনুসারে জাতির বীজ এবং অবশেষকে রক্ষা করবার জন্য স্থির হল আপাতত আত্মগোপন করে বাঁচতে হবে। যারা বয়স্ক, যাদের উপনয়ন সংস্কার হয়ে গিয়েছিল, রক্তবর্ণ উপবীত যাঁদের চিহ্ন তাঁরা বনের মধ্যে সমবেত হয়ে, অগ্নিকুণ্ড জেলে রক্তবর্ণ উপবীত অগ্নিকে সমর্পণ করে বললেন—তুমি আমাদের বংশের আদিপুরুষ কুলদেবতা, তোমার কাছে গচ্ছিত রইল আমাদের উপবীত। স্বাধীনতা অর্জন করে এই উপবীত যেদিন চাইব সেদিন তুমি আমাদের ফিরিয়ে দিয়ো। এই ভূমিকে চিহ্নিত করবার জন্য ভূমির নাম হল সুতাছাড়া।

তারপর তাঁরা আশ্রয় নিলেন স্থানীয় অধিবাসীদের ঘরে। মাইতি মণ্ডল অধিকারী সামন্ত প্রভৃতি নানান ঘরে আত্মগোপন করলেন, এবং আশ্রয়দাতার উপাধিতে পরিচয় দিয়ে আত্মগোপন করে তখন বাঁচলেন।

পরে অবশ্য একাংশ আবার পূর্ব উপাধি এবং উপবীত গ্রহণ করে উড়িষ্যার ক্ষত্রিয় রাজাদের অধীনে কর্ম নিয়েছেন। একাংশ সেই উপবীতহীন অবস্থায় আশ্রয়দাতার উপাধি গ্রহণ করেই কৃষিকর্ম করেন। আর দিন গণনা করেন কবে আসবে স্বাধীনতা। আজ তাঁরা শোলাঙ্কী রাজপুত হলেও শুক্লী নামে পরিচিত। প্রতীক্ষা করে আছেন এদিন কবে ঘুচবে।

এরই মধ্যে দলপৎ সিং-এর পিতামহ প্রথম যৌবনে একদল বাগ্দী সৈন্যদের নিয়ে এসে দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে বসতি স্থাপন করেছিলেন। বাগ্দী সৈন্য নিয়ে রাজত্ব করতেন অরণ্যের মধ্যে। একেবারে আরণ্য জীবন। অরণ্যই রাজত্ব। সেখানে অবাধ স্বাধীনতা। না থাক সভ্যতা।

* * *

এর দুপুরুষ পরের পুরুষ দলুই সর্দার।

দলুই সর্দারের জীবনেও একটা দারুণ বিপর্যয় এসেছিল। সেই বিপর্যয়ের ফলে দলুই সর্দার তার অনুগত বাগ্দী পাইকদের নিয়ে পিতামহের স্থাপন করা অরণ্য রাজ্য ছেড়ে আরও নিবিড়তর জঙ্গলে এসে বসতি স্থাপন করে, সেই দিন গণনা করছে কবে আসবে সুদিন সুপ্রভাত। সে আজ বিশ বৎসর হয়ে গেল।

দলুই সর্দার নিজেই জায়গাটার নামকরণ করেছে 'ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গলগড়'। 'জঙ্গলগড়' কথাটার সঙ্গে ছত্রিশ জাতিয়া শব্দটা যোগ হওয়ার একটা কারণ আছে। এখানে বিশ বছর আগে—ছত্রিশ জাতিয়া নামে একটা বিচিত্র জাত বাস করত। তারা এদের কাছে হার মেনে

এদের সঙ্গেই বাস করছে।

উড়িষ্যার সড়ক থেকে দূরে একটা গভীর জঙ্গল এবং পাহাড়ে জায়গার উপর ছোট একখানি গ্রাম—ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গলগড় গ্রামে ঘর তিরিশেক পাইকের বাস। তবে পাহাড়টার মাথাটা এবং আরও কয়েকটা ছোট পাহাড়ের মাথায় আরও খান-আষ্টেক গ্রাম নিয়ে বেশ ছোট একটি পাইক রাজত্ব বলা চলে। এরই মধ্যে খড়ের চাল কিন্তু মোটা মোটা পাথর ও কাদায় গাঁথা দেওয়াল, খোয়া পিটানো মেঝে, একখানি অপেক্ষাকৃত বড় বাড়ি। সামনে একটা চণ্ডীমণ্ডপ। তার সামনে শক্ত শালকাঠের খোদাই খুঁটির উপর তৈরি একটা আটচালা। আটচালার সামনে পাথর কাদায় গাঁথা ছুটো মোটা খাটো থাম—অর্থাৎ ফটক। আটচালায় একটা বড় নাগরা। এটি এখানকার এই দশখানা গ্রামের পাইক সমাজের সর্দার দলুই শুক্লীর বাড়ি। দলুই সর্দার নতুন অভিযানের খবর পেয়ে চণ্ডীমণ্ডপে বসে ভাবছিল বিশ বছর আগে যখন তারা এখানে প্রথম এসেছিল তখনকার কথা। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল মীর হবিবের ধ্বংস না হলে লোকসমাজে সে ফিরবে না। শোলাকী রাজপুতদের জীবনে যে বিপর্যয় কয়েক পুরুষ আগে এসেছিল তার পিতামহের আমলে, তারপর দলুই সর্দারের আমলে এই মীর হবিবের চক্রান্তে এসেছিল দ্বিতীয় বিপর্যয়। তখনই এই প্রতিজ্ঞা করেছিল সে।

বিশ বছর পূর্বে চন্দনগড় জায়গীরের রাজা মাধব সিং-এর মৃত্যুর পর তারা ওই জায়গীরে তাদের বসত ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে আত্মগোপন করে এখানে এসে বসবাস স্থাপন করেছে। তখন ওরা সংখ্যায় ছিল কম। মীর হবিবের চক্রান্তে মাধব সিং রাজা—তাঁর জামাই খুন হয়েছেন। সমস্ত সক্ষম শুক্লীরাজপুত আর বাগ্দী পাইকরা লড়াই করে মরেছে। বাকী কিছু সক্ষম পাইক আর নিজের কন্যাকে নিয়ে দলুই সর্দার এখানে এসেছিল। আর সঙ্গে ছিল কেবল পাইকদের মেয়েছেলেরা। এখন ওরা দশখানা গ্রামে বিশ থেকে তিরিশ ঘর হিসেবে আড়াইশো ঘর। তখন সংখ্যায় ছিল একশোজন। তার মধ্যে তিরিশজন জোয়ান, বাকি সব মেয়েছেলে। চন্দনগড়ে ওরা ছিল চার-পাঁচশো জোয়ানের একটি দল। কিন্তু চন্দনগড়ের ছত্রি সেপাইরা তাদের সমূলে ধ্বংস করবে বলে আক্রমণ করবার উদ্যোগ করতেই ওরা বেরিয়ে পড়ে। হাজার দেড়েক ছত্রি পল্টন তাদের আক্রমণ করতে তারা ঘুরে দাঁড়ায়। জনকয়েক ছেলেমেয়েদের নিয়ে বনের মধ্যে প্রবেশ করে। যারা লড়াই দিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল তাদের বড় কেউ ফেরে নি। দলুই সর্দার বাকি জোয়ান আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিবিড় থেকে নিবিড়তর জঙ্গলে প্রবেশ করে। এখানে এসে একদিন রাত্রে বিশ্রামের জন্য থামে। অনেক রাত্রি অনেক জায়গায় তারা থেমেছে, আবার সকালে যাত্রা করেছে। থামবার ইশারা ছিল জল। সন্ধ্যার মুখে জল সন্ধান করে যেখানে জল পেত, সেখানেই তারা গাছতলায় গাছতলায় রাত্রের আস্তানা পাততে। কিন্তু রাস্তার ধারে নয়। যাত্রা বলতে গেলে নিরুদ্দেশ।

সেদিনও সন্ধ্যার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে সর্দার কয়েকজনকে চারিদিকে জলের সন্ধানে পাঠিয়েছিল। যারা যেত তারা হাতে কাটারি আর পিঠে বর্শা বেঁধে নিয়ে যেত; যাবার

সময় যেত পথের গাছে কোপ মেরে দাগ রেখে রেখে, অধিকন্তু গাছের ডালও কেটে কেটে ফেলে যেত। যেটার নিশানা ধরে তারা পথ না হারিয়ে ঠিক ফিরে আসত। সেদিন দলুই সর্দারের চিন্তার অবধি ছিল না। কারণ তার একমাত্র কন্যা পূর্ণগর্ভা, তার শরীর সেদিন ভাল ছিল না। দলের মেয়েদের মধ্যে প্রবীণা অম্বিকে বাগ্দিনী এসে তাকে বলেছিল—সর্দার, আর হাঁটা হবে নাই বাপু, থামতে হবেক।

তখন বেলা তিন প্রহর। দলুই জিজ্ঞাসা করেছিল, ক্যানে? তু যদি না পারছিস তো ওই একটো ছালার ঘোড়ার পিঠে চড়্। লইলে কারুর পিঠে ওঠ্। না পারিস তো থাক্ পড়ে। বাখে তুকে ধরে থাক।

—উঁহু। সি লয়। রুক্মিণীর শরীলটো খারাপ করছেক। কি হয়।

চমকে উঠেছিল দলুই। রুক্মিণী আসন্নপ্রসবা। তার এই প্রথম সন্তান এবং রুক্মিণীর এই শেষ।

রুক্মিণী বিধবা হয়েছে। সদ্য-বিধবা সে। সিঁথির সিঁদুর মুছে সে চেপেছে ডুলিতে। কেঁদেছে যদি তবে ডুলির মধ্যে বসে কেঁদেছে। জানলে একমাত্র জানে ওই বুড়ী অম্বিকা বাগ্দিনী। অম্বিকাই তাকে মানুষ করেছে তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর। লোকে অম্বিকাকে তার দাসী ও স্নেহের পাত্রী বলে—সে তা অস্বীকার করে না।

সে এখন শুক্লী—আগে ছিল শোলাকী। রাজপুতানার শোলাকী রাজপুত। তারা ভীলেদের কন্যা ছিনিয়ে আনত। এখনও আনে, আনে এই সব জাত থেকে।

যে জায়গাটার কথা হচ্ছিল সেটা আস্তানা গাড়বার পক্ষে ছিল অত্যন্ত খারাপ জায়গা। একজন ছোকরা বাগ্দী একটা খুব উঁচু গাছে চড়েও জল দেখতে পায় নি। তার উপর জঙ্গলের আবরণ ছিল বড় পাতলা। আধ ক্রোশ দূরে একটা সড়ক। সেখানকার রাহীদের চোখে পড়বার ভয় আছে। দলুই সর্দার বলেছিল সকলকে ডেকে—হাঁকিয়ে চল, জোরে চল।

ডুলির বাহকদের সঙ্গে চলেছিল জন বিশেক জোয়ান, আর ঘোড়াগুলো। দলে মানুষই শুধু ছিল না, তার সঙ্গে কুড়িটা ঘোড়া ছিল। গোটা তিরিশেক গরু ছিল। তাদের পিঠে ছিল তাদের ঘর-সংসার—যাযাবরের সংসারের মত। ছেলেমেয়ে গরু প্রভৃতি নিয়ে তিরিশ জন জোয়ান, জনা দশেক বৃদ্ধ মন্থর গমনে পিছিয়ে আসছিল পথের নিশানা ধরে। আগের দলের জোয়ানেরা ওই গাছের ডাল কেটে কেটে নিশানা রেখে যাচ্ছিল।

সন্ধ্যে হয়-হয় এমন সময়ের মুখে উৎকণ্ঠিত দলুই সর্দার পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে চিন্তিত মুখে জল খুঁজতে পাঠিয়েছিল। এখনও দণ্ড দেড়েক বেলা আছে। যে জায়গায় তারা এসে পৌঁছেছিল—সে জায়গায় বনটা নিবিড়। সামনে খানিকটা পশ্চিমে কয়েকটা পাহাড়, তার তলায় জঙ্গল আরও ঘন। রাত্রিতে আর অগ্রসর হওয়া যাবে না। গেলে ওই পাহাড়ের বাধায় ঠেকতে হবে। রাত্রে ক্লান্ত মানুষ জানোয়ার কারু পক্ষেই সম্ভবপর নয় পাহাড়ে ওঠা বা পথ খুঁজে বের করা। সড়ক অনেকখানি ছেড়ে বনের ভিতর ঢুকছে তারা। সেখানেই

খেয়েছিল। মনে ভরসা হয়েছিল পাহাড় যখন আছে তখন নিশ্চয়ই ছোটখাটো কোন জোড় বা নদী মিলবেই। বইবে তারা পূর্ব মুখে, কিংবা দক্ষিণ মুখে। কারণ পূর্ব-দক্ষিণে সমুদ্র আছে।

কিছুক্ষণ পর লোক ফিরে এসে বলেছিল নদী একটা আছে। জল সে সঙ্গে এনেছিল। রাস্তার নিশানাও রেখে এসেছিল। সেই নদীর কাছাকাছি গিয়ে তারা আস্তানা গেড়েছিল রাত্রির মত। সারারাত্রি প্রসববেদনায় কাতরেছিল রুক্মিণী, কিন্তু প্রসব হয় নি। একটা জায়গা কাপড় দিয়ে ঘিরে তার মধ্যে রুক্মিণীকে নিয়ে বসে ছিল অম্বিকা এবং ওদের অন্য প্রবীণারা। দলুর বিধবা বোনও ছিল। থাকবার মধ্যে দলুর আছে ওই বোন আর মেয়ে। সন্তান হয়েছিল ভোরবেলা সূর্যঠাকুরের উদয়-লগ্নে। পাখির ডাকের সঙ্গে শিশুর কান্না মিশে গিয়েছিল। দলু সর্দার সারা রাত্রি উদ্বেগে জেগেই বসে ছিল। ঘুম আসে নি। বনের রাত্রির শুব্ধতা বড় বিচিত্র। সারা অরণ্য জুড়ে ঝিঁঝির ডাক, বনঝোড়া অন্ধকারের মধ্যে একটা বন-জোড়া নিরবচ্ছিন্ন শব্দপ্রবাহ বেয়ে যায়। অন্ধকারই যেন গুনগুন করে কাঁদে, নয়তো অবিরাম মৃদু তরঙ্গে হাসে। নয়তো ঘুঙুর পরে নাচে। তার আর উঁচুনীচু পর্দা নেই, একটানা—এক পর্দার। মধ্যে মধ্যে নিশাচর পাখি ডাকে। কোন পাখি হা-হা করে হাসে, কোন পাখির বাচ্চারা চেঁচায়—যেন কাঁদে। প্রহরে প্রহরে প্যাঁচাদের সমবেত ডাক ওঠে। শেয়ালেরা ডেকে ওঠে। মধ্যে মধ্যে হো-হো, নেকড়েরা ডাকে। বড় খ্যাঁকশেয়ালী খ্যাক-খ্যাক শব্দ করে ডাকে। দূরে শম্বরেরা ডাকে। সারারাত্রির মধ্যে বার তিনেক বড় বাঘের গর্জনও শুনেছে দলু।

তারই মধ্যে পথশ্রান্ত ছেলে-মেয়েরা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে; কোন উদ্বেগ হয় নি, আতঙ্ক হয় নি। জঙ্গল মহলের বাসিন্দা তারা, এসবের কিছুই তাদের কাছে নতুন নয়। রাজাদের বাসস্থান মাত্র একটা বড় গ্রাম। একটা মাটি ও পাথরের পাঁচিলের মধ্যে গড়, সেই গড়ের মধ্যে রাজবাড়ি। দু-চারখানা পাকা ছাদের দালান, বাকি সবই মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল, পোক্ত শালকাঠের কাঠামো। শালকাঠ এখানে প্রচুর। শালকাঠের দেওয়াল, মেঝে ঘরেও আছে কিছু কিছু। গড়ের বাইরে গ্রাম। দু-চার, বড়জোড় ন-দশখানা দোকান; আর থাকে একটা হাট। হাটগুলো বড় হয়। গ্রামের আশপাশ থেকেই জঙ্গল শুরু। গ্রামের বাসিন্দারা প্রকৃতপক্ষে বনের মধ্যেই শুয়ে থাকে, ঘুমোয়, বাস করে। কিছু কিছু চাষের জমি থাকে। তার চারিদিকেও অরণ্য।

নবাবী সেরেস্তায় অঞ্চলটার নামই জঙ্গল মহল। আর বাগ্দীদের বসবাস বলে একটা পরগণার নামই হয়ে গেছে বাগড়ী পরগণা।

পাইক বাগ্দীদের ছেলে-মেয়েরা পুরুষ বৃদ্ধ নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে। ঘুমোয় নি কেবল যারা পালা করে পাহারা দিচ্ছিল তারা। আর ঘেরার মধ্যে প্রসবযন্ত্রণাকাতর রুক্মিণী, তার দুই পাশে অম্বিকা বাগ্দিনী ও দলুইয়ের বিধবা বোন অহল্যা আর দাইয়ের কাজ জানা মাসী। দলুই চোলাই মদ খেয়েছে, আর কল্কেতে সেজে শুধু তামাক টেনেছে। তার সঙ্গে শুধু ভেবেছে —রুক্মিণী যদি মরে যায়? হে ভগবান, হে গোবিনজী, হে কিষণজী, হে রাম! তার গোবিন্দ-কিষণজী তার সঙ্গেই আছে। তাকে সে ভুলে আসে নি। সারাটা পথ সেই চন্দনগড় থেকেই

সে বলতে বলতে আসছে, তুমি শেষে এই করলে কিষণজী! এই তোমার মনে ছিল গোবিনজী! সে সব কথা আজ এই খবর শুনে যেন নতুন করে মনে পড়ছে। মনে পড়ছে সেদিন সে ভেবেছিল—হায় কপাল! এককালের শোলাঙ্কী রাজপুত তারা। তাদের দেবতা শিব আর কিষণজী। বীরসিংহে তাদের শিব এখনও আছেন। মহারাজ বীরসিংহের বংশ তারা। তারা বারভাইয়া গুলকি। মহারাজার রাজ্যে সেনাপতি মন্ত্রী নিয়ে ছিল বাহাত্তরজন রাজপুত, তাদের বংশধরেরা বাহাত্তর-ঘরি, বাকি পল্টনের লোক সাধারণ রাজপুত। তারা দশাশই। দলুইয়ের পিতামহ জ্ঞাতি এবং পাইকদের নিয়ে বাস করত তখন আর এক জঙ্গলের মধ্যে—বীনপুরের থেকেও পাঁচকোশ দূরে জঙ্গলের মধ্যে একটি গ্রামে। একটা ছোট নদী ওখান থেকে গিয়ে মিশেছিল কাঁসাইয়ে। সেই ছোট নদীর ধারে; অঞ্চলটা ঘন বনের অঞ্চল। তারা রাজপুত দশ বারো ঘর ছাড়া বাগ্দীরা ছিল প্রায় শ'দুয়েক ঘর। তার পিতামহ ছিলেন সকলের মালিক। তার পর তাঁর এক ছেলে—ছেলে মারা গেল জোয়ান বয়সে তিন ছেলে রেখে। এই তিন ছেলেকে মানুষ করেছিলেন সেই বৃদ্ধ বীর ভূপৎ সিং। তিন তিন নাতির মধ্যে ভাগ করে দিয়ে গিয়েছিলেন পাইকদের মালিকানি স্বত্ব। দলুই ছিল পঁচিশ ঘরের সর্দার। পঁচিশ ঘর মানে—একশো পঁচিশ ত্রিশ বাগ্দী পাইক। পঞ্চাশ বছরের বাপ—তার দুই ভিন ছেলে। বত্রিশ থেকে বাইশ। তাদের সঙ্গে বিড় ছেলের ছেলে চোদ্দ-পনের বছরের। আবার যার বয়স ষাট-বাষট্টি—তার ছেলের বয়স বিয়াল্লিশ চল্লিশ থেকে ছোটর বয়স বত্রিশ। তার ঘরে বাইশ থেকে পনের-ষোল বছরের ছয় সাত নাতি। বাগ্দী পাইকের ছেলে, চুয়ার পাইকের ছেলে বারো বছর থেকে লড়াই শেখে। লাঠি, তীর, ধনুক, গুলতি, তলোয়ার, বর্শা চালাতে শেখে।

দলুর বড় ভাই গুণা সর্দার ছিল সবার উপরে মানুষ। গণপৎ আর দলপৎ তাদের নাম। ছোট ভাইয়ের নাম ছিল ধনপৎ—ধনা সর্দার। এরা ভগবান ছাড়া কারুর অধীন ছিল না। এই অরণ্যরাজ্যে আপন আপন সর্দারি নিয়ে বাস করত। কোন রাজার সঙ্গে কোন রাজার বিবাদ উপস্থিত হলে এরা সে সময় তাদের কাছে টাকা নিয়ে যুদ্ধ করত। মধ্যে মধ্যে বনে বনে দূরদূরান্তর গিয়ে চাষেবাসে সমৃদ্ধ সমতল গ্রামগুলি লুঠে ধান চাল টাকাকড়ি নিয়ে আসত, অনেক সময় হুকুমনামা পাঠাত—আমরা যাব, আমাদের জন্য যেন এই সব মাল মজুত থাকে। অনেক সময় ওদিকে উড়িষ্যা, এদিকে চন্দ্রকোণা সড়ক ধরে এগিয়ে যেত। যে সব মহাজন মাল নিয়ে যেত, তাদের কাছে কর আদায় করত। বাধা দিলে সব লুঠে নিত। নবাবী ফৌজের পিছনেও তারা লুঠেছে, পাঠান ফৌজেরও লুঠেছে। ছোটখাট ফৌজের দলের উপর এদের লোভ বেশি, আর তাদের সঙ্গে লড়াই করে আনন্দও বেশি। তাতে শুধু রসদই মেলে না, টাকাকড়িই মেলে না, তার সঙ্গে হাতিয়ার মেলে। এবং এইসব পেশাদার সিপাহীদের সঙ্গে লড়ে হারিয়ে গৌরবও অনুভব করে বেশি। লুটতরাজ করে এসে তাদের পিতামহের প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরে জয়ধ্বনি দিত। থরথর করে গাছের মাথা কাঁপত। বনে বনে শব্দ ছুটে যেত দূরে-দূরান্তরে। ঘণ্টা বাজত দেবতার মন্দিরে—বলত খাজনা এসেছে তাদের রাজ্যের। ওদের বাড়িতেই ছিল ওদের ঠাকুর। উপবীত ত্যাগ করে ভিন্ন উপাধি নিয়েও

স্বধর্মের বীজটুকু ওরা হারায় নি। পৈতে ফেলেও ওরা কিষণজী গোবিনজী যোগমায়াকে ভোলে নি। পিতামহের ঠাকুর—গোপাল, কিষণজী আর মা যোগমায়া। ঠাকুরগুলি পাথরের। উড়িষ্যা থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন ওদের বাপ। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পিতামহ ভূপৎ সিং। তাদের তিন ভাইকে ভাগও করে দিয়েছিলেন ওই তিনি—ভূপৎ সিং—দলুর দাদ্দো অর্থাৎ পিতামহ। বড় নাতিকে তিরিশ ঘর, মেজকে পঁচিশ ঘর, ছোটকে বিশ ঘর পাইক যেমন দিয়েছিলেন তেমনি দিয়েছিলেন তিন ঠাকুর তিন জনকে। গোপাল তাদের প্রথম ঠাকুর, পেয়েছিল গণপৎ, দলপৎ পেয়েছিল কিষণজী, ধনপৎকে দিয়েছিলেন যোগমায়ার সেবা।

তিন ভাই বিপদে এক হলেও অন্য সময়ে ছিল পরস্পরের বিরোধী। কত প্রতিযোগিতা চলত দেবসেবার সমারোহ নিয়ে। তা ছাড়া ছোটখাটো ঝগড়া তো ছিলই।

দলুর কন্যাভাগ্যে কিষণজী যেন জাগ্রত হয়ে উঠেছিলেন। সাত আট বছর বয়স থেকে 'ফিরানি' কাপড় (গামছার আকারের) কোমরে জড়িয়ে গায়ে একটা কাঁচুলি পরে কিষণজীর মন্দির-অঙ্গন পরিষ্কার করত, পূজার ফুল তুলত, সন্ধ্যায় সময় হাতে তালি দিয়ে নাচত। মাঝে-মধ্যে সন্ন্যাসী সাধু আসতেন। অরণ্যভূমের শুক্লী যাদের দেহের ভিতরে রাজপুতানার শোলাঙ্কী রাজপুতের রক্ত, তাদের ঘরের মেয়েরা খেলতে খেলতে চলে যেত বনের মধ্যে। তখন থেকেই বনকে চিনত। বনের মধ্যে যে রহস্যময়ী প্রকৃতি আছে—যার বিচিত্র রূপ, যার এক অঙ্গে ফুলের হার ফুলের কঙ্কন, সে অঙ্গের পরনে গাছের বাকল, পাতার পাড়, লতার বালা, সেদিকের হাতের বীণায় বাজে পাখির গান, ঝরনার শব্দ—তার অন্য অঙ্গের দিকে তাকালে শিউরে উঠতে হয়। অন্য অঙ্গে ফুলের হারের স্থানখানা হয়েছে সাপের হার। সেদিকের হাতে বৃশ্চিকের বাজুবন্ধ, প্রকোষ্ঠে হাড়ের কঙ্কন, হাতের আঙুলে বাঘের নখ। সে হাতে আছে ভয়াল শিঙা, তাতে ফুঁ দিলে জাগে বাঘের ডাক, হাতীর গর্জন। সেদিকের অঙ্গে পরনে আছে বাঘের ছাল—তাতে অজগরের চামড়ার পাড় বসানো। বনের ঠাকুরাণীর একদিকের ঠোঁটে হাসি, অন্যদিকে ক্রোধ হিংসা। একদিকের মুখে খায় মধু—অন্যদিকের মুখে ওগরায় বিষ। এ প্রকৃতিকে বনের মেয়ে চেনে। বনের মেয়ে, তার উপর শুক্লীর মেয়ে, তাকে সে ভয় করে না। ছেলেবেলা থেকে তার সঙ্গে মিতালি তার। চলে যেত বনে ফুল তুলতে, চলে যেত ফলের সন্ধানে, চলে যেত সজারুর কাঁটা খুঁজতে। পাখি দেখতে। সঙ্গে থাকত বাগ্দিনী সঙ্গিনীরা। একবার বনের মধ্যে গাছতলায় এক সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়ে তাকে হাতের ফুলগুলি দিয়ে জোড় করে বলেছিল, সাধুজী, আমাদের বাড়িতে কিষণজীর মন্দিরে সেবা নিবেন আসুন।

সন্ন্যাসী এই মেয়েটির অনুরোধ আর কিষণজীর নাম—এ ঠেলতে পারেন নি। এসেছিলেন। কিষণজীকে দেখে ভক্তিভরে প্রণাম করে বলেছিলেন, ক্যা নরা খেল খেলনে কো লিয়ে ইয়ে বনমে ফির বনবিহারী বন্ গিয়া রে খেল্‌নেওয়ালা। বড়া বদ্‌মাস হো তুম—বড়া বদ্‌মাস। ইয়ে লেড়কী কি বদ্ধনমে গির গয়া? আঁ?

যাবার সময় বলেছিলেন, সর্দার, শুনো বেটা। ইয়ে লেড়কী তুমহারা বহুত ভাগ্‌মানী হ্যায়, কিষণজীকে পিয়ারী হ্যায়। ইয়ে তো বাবা রাণী বনেগী, রাজমাতা হোগী। ইন্‌কি কভি

কুছ খারাব নেহি বোল্‌না। কভি না। হাঁ! তোমারা কুল, বন্‌শ্‌ উজালা কর্‌ দেগি।

সেই অবধি দলু মেয়েকে কিছু বলে নি। বলত না কখনই। স্ত্রী মেয়েকে দু বছরের রেখে মারা গিয়েছিল, কিন্তু সে আর বিয়ে করে নি। তা বলে সে ব্রহ্মচারী ছিল না। অরণ্য জীবনে দুর্বার মোহ আছে। সেই মোহবশে তার তখন তিন-চারটি সেবিকা। তারা বলে 'রাখনি'। তার মধ্যে দুটো ছিল লুঠে আনা মেয়ে। আর এই অম্বিকে বাগ্দিনী। বালবিধবা অম্বিকেকে সে প্রথম যৌবনে স্ত্রীর মৃত্যুর পর ভালবেসে ঘরে এনেছিল। অম্বিকেই মানুষ করত রুক্মিণীকে।

রুক্মিণীর আদর ছিল যথেষ্ট। সে আদর আরও বাড়ল সাধুজীর কথায়। সে কিষণজীকে নিয়ে প্রায় খেলা শুরু করে দিলে। মধ্যে মধ্যে বাপকে বলত, বাবুজী, আজ কিষণজী এই মিঠাই খেতে চেয়েছে। দলু বিশ্বাস করত এবং সেই মিষ্টি যোগাড় করে ভোগ দিত। এমনি নানানতর কথা বলত রুক্মিণী।

একবার সে বললে, বাবুজী, কিষণজী বলেছেন তুই নাচ শেখ রুক্মিণী, তোর নাচ আমি দেখতে ভালবাসি। গীত তুই ভালই গাস। আমি নাচ শিখব বাবা।

দলু সর্দার তাও অবিশ্বাস করে নি। অনেক ভেবেচিন্তে বিষ্ণুপুরের দরবারে গিয়ে সেখান থেকে নিয়ে এসেছিল নাচিয়ে এক প্রৌঢ়া বাঈকে। নিয়ে আসা ঠিক নয়, প্রায় চুরি ডাকাতি করে এনেছিল। পাণ্ডা সেজে গিয়ে বলেছিল, আমি আসছি পুরী থেকে। মহাপ্রভুর বড় ইচ্ছা তোমার নাচ দেখেন। অবিশ্বাস করো না। তোমার টাকা অলঙ্কারের ভয় তুমি করো না। তুমি শুধু চল, একটি অলঙ্কার নেবে না, একটি পয়সা নেবে না, সব আমাকে দিতে হুকুম হয়েছে। ভেবে দেখ, তোমার যৌবন গেছে, রাজদরবার তোমাকে ডাকে না, যারা রূপ যৌবন বিলাসী, তারা তোমার দিকে তাকায় না। সুতরাং কোন লোভে আমি আসি নি। দেবতার হুকুমে এসেছি।

প্রৌঢ়া অবিশ্বাস করে নি। সে সানন্দে রাজী হয়েছিল। দলু বলেছিল, কিন্তু একলা যেতে হবে। আমি তোমাকে ডুলি করে নিয়ে যাব।

শহরের বাইরে তার দল ছিল, ডুলি ছিল। সকলেই পুরীর লোক সেজেছিল। তারপর নিয়ে এসে তুলেছিল তাদের অরণ্যের আস্তানায়। সেখানে কিষণজীর মন্দিরের সামনে তাকে নামিয়ে বলেছিল, ইনিই মহাপ্রভু। যিনি জগন্নাথ তিনিই কিষণজী। এঁর আদেশেই আমি গিয়েছিলাম। রুক্মিণীকে কাছে এনে দেখিয়ে সকল বৃত্তান্ত বলেছিল শপথ নিয়ে। তারপর বলেছিল, রুক্মিণীকে আমার নাচ শিখিয়ে দাও বাঈ। আমি তোমাকে বলছি তুমি আমার মা, আমি তোমাকে ছেলের মত রক্ষা করব, যত্ন করব, আর নাচ শেখানো হলে আমি নিজে তোমাকে পুরীতে নীলমাধব দর্শন করিয়ে আনব।

সে কথা সে রেখেছিল। এককালের নামকরা লাস্যময়ী সরস্বতী বাঈ যে যৌবনে লাস্য ও রূপের জন্যে নাম পেয়েছিল সুরতিয়াবাঈ, সে প্রৌঢ়া বয়সে এখানে ওই কিষণজীর সামনে রুক্মিণী বেটিয়াকে নাচ গান শেখাতে এসে বসলে গিয়েছিল। এবং পুরী যাবার সময় বলেছিল, সর্দার বাপুজী, তোমাকে, তোমার বেটীকে আমার বহুৎ বহুৎ আশীর্বাদ দিয়ে যাচ্ছি। তোমরা

আমাকে ওই নাগরের প্রসাদ দেওয়ালে। আমার জিন্দগী সফল হয়ে গেল। ধন্য তোমার বেটী। তবে তোমার বেটীকে আমি শুধু নাচ আর গান শেখাই নি, আরও অনেক দিয়েছি। ও যদি কোন রাজার সামনে দাঁড়ায় তবু ঠকবে না। ওই নাগরের সামনে দাঁড়াবার মূলধন—সে ওর আছে। তাই ও আমাকে দিয়েছে।

রুক্মিণী সত্যসত্যই আশ্চর্য কন্যা হয়ে উঠেছিল। লাস্যে হাস্যে বাক্‌চাতুরীতে সুরজিয়াবাঈ বলতে গেলে ওকে নাগরী করে তুলেছিল। মুখে মুখে উর্দু গান বয়েৎ মুখস্থ করিয়েছিল।

রুক্মিণীর বয়স যখন ষোল তখন বিয়ের সমস্যায় দলু সর্দার খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। একে তারা শুক্রী তার উপর দলুরা বনে বাস করে অরণ্যের মানুষ হয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে নিজের জাত ছাড়া কারুর সঙ্গে চল নেই। এ মেয়ে দেবে কার হাতে? নিজেদের জাতির মধ্যে তারা আবার বারোভাইয়া; জানাশোনা বারোভাইয়া যারা তাদের ঘর খোঁজ করে কোন ছেলেকেই পছন্দ হচ্ছিল না তার। এমন সময় একদিন রুক্মিণী বললে, বাপ্‌!

—কি বেটী?

—তুমি আমার শাদির লেগে মাথা ঘামিয়ো না। আমার মন উঠছে না বাপ।

সাধুর কথা স্মরণ করেও দলু বলেছিল, কার হাতে তুকে দিয়ে যাব বেটী? আমি অমর লই। মরব তো একদিন।

—কেন বাপ্‌, ওই তো রয়েছে কিষণজী!

—তোর সঙ্গে কথা হয় বেটী?

—না বাপ্‌, আমি বলি, ও বলে না। তা বলাব একদিন। আর না বলে তোমার সর্দারী আমি করব।

—তুই আমার কাছে ঠিক বাত বলছিস না। কিষণজীর সঙ্গে বাত তোর হয়।

রুক্মিণী হেসে বলেছিল, না গো, বাপ্‌. আমি ঝুটা কেন বলব তোমাকে

তবু বিশ্বাস করে নি দলু। সে বিশ্বাস করেছিল তার মেয়ের সঙ্গে কিষণজী কথা কয়, সে তার প্রেমে পড়েছে। কিন্তু হাজার হলেও বেটী, আর সে তার বাপ, লজ্জায় বলতে পারছে না।

অম্বিকাও তাকে তাই বলেছিল।

রুক্মিণী শুক্রীর মেয়ে, ছেলেবেলা থেকে অরণ্য জীবনের স্বভাবধর্মে আত্মরক্ষার জন্য তীর-ধনুক বর্শা ছুঁড়তে শিখেছিল। একটা বাজপাখি পুষেছিল। পাখিটা ছিল পক্ষিণী। ইচ্ছে করেই সে পুরুষ পাখি পোষে নি। বলেছিল, ওই একটা পুরুষ পুষেছি, তাকেই মানাতে পারছি না, আবার পুরুষ পোষে!

পাখিটা নিয়ে শিকার করতে যেত। তীরধনুক নিয়েও শিকার করত। আজ থেকে একুশ বছর আগে দোলের পর কিষণজীকে নিয়ে সে এবং তার সখী সম্প্রদায় মিলে গিয়েছিল বনভোজনে। তাদের গ্রাম থেকে ক্রোশখানেক দূরে ঝরনার ধারে বনভোজন। ঠাকুরকে একটা পাথরের উপর বসিয়ে চলছিল তাদের নাচ গান। তামাশা রঙ্গ সব ওই দেবতাটিকে নিয়ে। এরই মধ্যে হঠাৎ তার বাজপক্ষিণী—সেটা ছিল একটা গাছের ডালে বাঁধা, সেটা উড়বার জন্য ঝটপট করে সারা হয়েছিল। কি হল তারা প্রথমে বুঝতে পারে নি। হঠাৎ এক

সখী আকাশের পানে তাকিয়ে বলেছিল, হুই দেখ সর্দার বেটি, হুই দেখ বলে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।

—কি ? কি ?

—হুই ! হুই ! দেখ আকাশের পানে চেয়ে। হুই সাদা পারা—হুই উড়ছে—ছুটছে গ !

দেখছিল তারা। এবং বুঝতে পেরেছিল আর একটা বাজপাখি উড়ে চলেছে ঠিক সাদা হাউইয়ের মত। আর প্রাণভয়ে উড়ে পালাচ্ছিল একটা সারস।

মেয়েটা তখনও হাসছে। মেয়েটার নাম মেনী, ভাল নাম মেনকা।

—এতে হাসছিস ক্যানে ?

বলে সে খুলে দিয়েছিল নিজের বাজকে। পক্ষিণীর নাম ছিল বাঁট্‌লী। অর্থাৎ বাঁটুলের নারী নাম।

পাখিটা ঝটকা মেরে আকাশে উড়েছিল এবং তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করেছিল। বাজপাখি শিকারের সময় ডাকে না। সে নিঃশব্দে ধায়।

রুক্মিণী আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, মর্—ডাকিস কেন ? খুব তো তাগদের গুমোর দেখি !

মেনী আবার হেসে বলেছিল, ডাকবে নাই ? পরাণ বলে আনচান করছে উয়ার। উটা মরদ লাগছে গ—সর্দার বেটী।

কথাটা মিথ্যা নয়। ওরা তাকিয়ে দেখতে দেখতেই দেখলে, বাঁট্‌লী আকাশে উঠতেই সেই বাজটা শিকার ছেড়ে বোঁ করে পাক দিয়ে একেবারে নিচের দিকে মুখ করে পাখা গুটিয়ে নিজেকে ছেড়ে দিলে, পড়তে লাগল রাত্রির আকাশ থেকে খসা তারার মত। তারপর মেলল পাখা। তখন তার থেকে আর মাত্র খানিকটা দূরে বাঁট্‌লী উড়ছে। বাঁট্‌লীও বাজপাখি। সেও বাজপাখির বিচিত্র ওড়ার কৌশল দেখিয়ে বাজকে নিচে রেখে উঠল উপরে। বাজও উঠল। বাঁট্‌লী পাশ কাটাল। বাজও বেঁকল। বাঁট্‌লী আবার ঘুরল। শূন্য মণ্ডলে সে যেন চোর ধরাধরি খেলা। বাজটাকে বাঁট্‌লী প্রায় নাজেহাল করে রাগিয়ে দিয়েছে। সে বিপুল বিক্রমে এবার যেন আক্রোশভরে তার দিকে ছুটল। বাঁট্‌লী কিন্তু আরও চতুরা—সে এবার সাঁ সাঁ করে আকাশ থেকে নামতে লাগল পাখা গুটিয়ে ছোঁ মারার ভঙ্গিতে। তারপর পাখা মেলে এসে বসল যে ডালটিতে সে বসেছিল সেই ডালে। বসেই দিল আর একটা ডাক। দেখতে দেখতে বাজটা এসে ঝপ করে বসল পাশে। বাজটা বড়। পুরুষ কিনা। পায়ে মলের মত সোনার গোল মল পরানো।

এবার সব সখিরা মিলে কলরব করে হেসে উঠল। তাই গো, একি ? মেনী বলেছিল, মরণ ! কাকে নিয়া আলি ল ! অ বাঁট্‌লী !

রুক্মিণীও হেসেছিল এবার। সে বলেছিল, দে লো, বাঁট্‌লীর বর এসেছে, ওকে খেতে দে।

সাধ হয়েছিল ওকে ধরবে। ভাল জাতের বাজ আর খুব শিক্ষিত বাজ। তাকে খেতে দিয়েছিল দুধের বাটি। সর চিনি। তা ছাড়া মাংসও ছিল। হরিণের মাংস।

শোলাঙ্কী রাজপুত শুক্লী হয়েছে, পেশায় যুদ্ধব্যবসায়ী। বহু বাঈজী পাইকের মালিক। ওরা উপাসনায় কিষণজীর উপাসক হলেও মাংস খায়, হরিণ শিকার করে, বুনো বরা মারে। তবে

কিষণজীর ভোগে তা দেয় না।

এখানেও হরিণের মাংস আলাদা রান্না হচ্ছিল, বাগ্দীদের মেয়েরা খাবে। খাবার সময় হতে হতে ছোট ছোট বাচ্চারা আসবে, তারাও খাবে।

মাংস খেতে দিয়ে সে একজন বাগ্দিনীকে পাঠিয়েছিল একটা ভালুকের বাচ্চা-রাখা খুব শক্ত লোহার খাঁচা আছে সেটা আনতে। ঠিক করেছিল খাঁচার ভিতর খাবার দিয়ে আগে ডাকবে বাঁটুলীকে। বাঁটুলী তার ডাকে ঠিক এসে ঢুকবে খাঁচায়, তখন তার পিছন পিছন বাচ্চাটাও ঢুকবে। বন্দী হয়ে যাবে পুরুষ।

কৌতুকে প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল তার মন।

সে গান গাইতে লেগেছিল—রে কানাইয়া, আজ সব সখিরা মিলে তোকে ঘিরে বন্দী করব। আঁচলের পাকে পাকে বাঁধব। হাতের বাঁধনে বাঁধব। বাঁধব তোর গলা, বাঁধব তোর দুই হাত, বাঁধব তোর দুই পা। আমার ঠোঁটে রাখব তোর ঠোঁট। দেখি, তুই পালাস কেমন করে।

এরই মধ্যে কখন যে একজন ঘোড়সওয়ার এসে সামনে ঝরনাটা যেখান থেকে ঝরছে সেই উঁচু পাথরের মাথায় দাঁড়িয়েছে তা কেউ দেখে নি। ঝরনা ঝরার শব্দের মধ্যে ঝরনাটার পিছন দিকে ওঠা ঘোড়ার খুরের শব্দও পায়নি তারা। যখন দেখল তখন তারা অবাক হয়ে গেল।

মাথায় পাগড়ি, পরনে চুস্ত পাজামা, গায়ে লম্বা পাঞ্জাবি চাদরের বেড় দিয়ে বাঁধা। পিঠে তূণ বর্শা। কোমরে তলোয়ার। রেকাবের উপর পায়ের নাগরা জুতো ঝক্‌ঝক্ করছে: কোন সম্ভ্রান্ত লোক এবং হিন্দু। মুসলমান নয়।

রুক্মিণীর দল স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এমন এক অপরিচিতের আবির্ভাবে। আবার খিলখিল করে হেসে উঠেছিল সেই মেনী। স্তব্ধতা ভঙ্গ হয়েছিল।

অপরিচিত বিশিষ্ট জনটি মেনীকে বলেছিলেন, হাসছ কেন?

—হাসব নাই! আপনি এলেন—কাঁদতে পারি?

রুক্মিণী এবার সংযত হয়ে এগিয়ে গিয়ে রাজকীয় ঢঙে সেলাম করে বলেছিল, জনাব, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি কোন মুলুকের মালিক। রইস আদমী। আপনি কে? আমরা এখানে মেয়েরা কিষণজীকে নিয়ে বনভোজনে এসেছি। শুধু মেয়েরা। এখানে আপনি?

তিনি বলেছিলেন, আমার হাউণ্ডের সন্ধানে এসেছি। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন বাজটাকে। হেসে বলেছিলেন, একটা সারস দেখে ওকে ছাড়লাম। ও উঠল। হঠাৎ দেখলাম আর একটা বাজ। ভাবলাম, বাজে বাজে শিকার নিয়ে লড়াই বাধবে। তারপর দেখলাম এই বাজটা ঘুরপাক খেয়ে নেমে পড়ল। আমার হাউণ্ডও তার পিছু পিছু ধাওয়া করে নেমে পড়ল এই বড় গাছটার কোলে। গাছটাকে নিশানা করে এখানে এসে দেখছি তোমরা নাচে গানে এমন মত্ত যে আমার ঘোড়ার খুরের শব্দও কানে গেল না। পরে বুঝলাম, ঝরনার শব্দের জন্য শুনতে পাও নি। কিন্তু খুব আনন্দে মত্ত ছিলে দেবতার সম্মুখে,

আমি সাড়া দিই নি। ভালও লাগছিল।

রুক্মিণী বলেছিল, তাহলে মেহেরবাণী করে আসুন, নেমে আসুন। নিয়ে যান আপনার বাজ।

নেমে এসেছিলেন তিনি। রুক্মিণী তাকে বসিয়ে বলেছিল, আপনার বাজকে আমরা খাইয়েছি দুধ, সর, মাংস। আপনি কিছু খান। দেবতার প্রসাদ।

তিনি বলেছিলেন, কি জাত? এদের তো দেখে মনে হয় বাগ্দী। তুমি? তুমি তো তা নও! চেহারাতেও পৃথক, তা ছাড়া এমন সহবতের কথা তো বাগ্দী মেয়ের নয়!

রুক্মিণী বলেছিল, আমি ক্ষত্রী রাজপুতের মেয়ে। এরা বাগ্দীর মেয়েই বটে। সহবতের কথা? আমার বাবা এক বাঈকে এনে রেখেছিলেন, তার কাছে শিখেছি। বিষ্ণুপুরের সুরতিয়াবাঈ।

—হাঁ হাঁ, শুনেছি বটে। সুরতিয়াবাঈ পাকা চুল ভাঙা গলা নিয়ে জগন্নাথ গিয়েছিল। বিষ্ণুপুর থেকে পুরী পৌঁছতে তার তিন বছর লেগেছিল। লোকে বলে, বনের ভিতর কোথায় সে তপস্যা করছিল। পুরীতে যখন গান গাইত তখন তার দুই চোখে ধারা বইত।

—দু বছর সাত মাস তিনি আমাদের এখানে ছিলেন, আমাকেই শেখাতেন নাচ গান সহবত।

—তোমার নাম কি?

রুক্মিণী কুর্নিশ করে বলেছিল, জনাব আলি, আপনি রইস আদমী; তরিবৎ সহবতের রাজা। আপনিই ফরমাস করুন, আমি কুমারী মেয়ে আপনার নাম আপনার পরিচয় না পেলে কি করে আমার নাম বলব?

—চন্দনগড়ের নাম তো জান?

সঙ্গে সঙ্গে নত হয়ে প্রণাম করেছিল রুক্মিণী। সঙ্গের সখীদের বলেছিল, প্রণাম কর, প্রণাম কর।

তারা সার বেঁধে নত হয়ে প্রণাম করেছিল।

তিনি হেসে হাত তুলে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, আমার নাম মাধব সিং।

—আমি জানি জনাব আলি, মালিক বাহাদুর! আমি বোকা, হাজার হলেও বুনো মেয়ে। দেখেই আমার অনুমান করা উচিত ছিল। অন্তত কপালের ওই দাগটা দেখে বোঝা উচিত ছিল। ষোল বছর বয়সে শুধু তলোয়ার নিয়ে একটা শেরকে মেরেছিলেন। তখন শেরের নখ বসেছিল আপনার কপালে! এটা মুলুকের সবাই জানে।

—হাঁ, দাগটা আমার চিহ্ন বটে।

রুক্মিণী বলেছিল, আমার নাম এবার বলি—

বাধা দিয়ে মাধব সিং বলেছিলেন—বলতে হবে না। আমি বোকা নই। তোমার নাম রাধা। অন্তত এই নামটা আমি দিলাম।

সেলাম করে রুক্মিণী বলেছিল, না মালিক, আমার নাম রুক্মিণী।

—ওই হল। দুয়ে তফাৎ কি?

—আমার গোস্তাকী মাফ হয় মালিক ; দুইই কিষণজীর প্রিয়তমা হলেও রাধাকে তিনি ছেড়ে পালিয়েছিলেন, দুখ দিয়েছিলেন। তা ছাড়া রাধার অনেক কলঙ্ক। আমি দুখও চাই না, কলঙ্কও আমার সইবে না। রাধা গোয়ালিন, আমি রাজপুতিন।

—সাবাস, সাবাস, সাবাস রুক্মিণী। আমি বোকাই বটে।

সখীরা অবাক হয়ে রুক্মিণীর এই বাকচাতুরি শুনছিল। তাদের সঙ্গে যে রুক্মিণী হাসে খেলে নাচে গায় এ তো সে নয়।

রুক্মিণী বার বার অভিবাদন করেছিল।

এই সময়ে এসেছিল খাঁচাটা। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ওটা কি হবে ?

এবার চন্দনগড়ের রাজা—লড়াইয়ে যাকে লোকে বলে রুস্তম, সেই রুস্তম, মাধব সিং সম্মুখে জেনেও মেনী আবার হাসতে শুরু করেছিল।

রাজা বলেছিলেন, তুমি বড় হাস। হাসছ কেন ?

মেনী ভয় পেয়ে বলেছিল, আপনি রাজা সাহেব, আমি ছোট বাগ্দীর বেটী, হাসি আমার রোগ বটে। দাঁতগুলান দুশমনের হাড়ে বিধাতা গড়ে বসায়ে দিয়েছে, ঠাঁই বাছে না, মানুষ বাছে না, বেরায়ে পড়ে।

—না না, তুমি হাস। ভাল লাগছে তোমার হাসি। কিন্তু হাসছো কেন ?

—হুজুর, আপনি নিজে বললেন, আপনি বোকা। তা খানিক বটেন। খাঁচা আপনার হইটাকে বন্দী করবার তরে—

হেসে রাজা বললেন, ওকে বন্দী করবে কে ? ধরে পুরবে কে ?

—আমাদের বাঁটুলি। সে দেখিয়ে দিয়েছিল রুক্মিণীর বাজকে।

—আচ্ছা !

—উটা মেয়ে বটে হুজুর !

—ও ! তা আর তো হবে না। আচ্ছা, একটা বাজ আমি তোমাদের দেব।

—উটাই লিব। দেখেন। লেন, আপুনি ডেকে লেন আপনার হইকে। বলেই বলেছিল, দাঁড়ান। তারপর খাঁচার দোর খুলে রুক্মিণীকে বলেছিল, লাও গো সর্দার বেটী, লাও, ভর তোমার বাঁটুলীকে খাঁচাতে, ডাক তুড়ি দিয়া। রাজা হুজুরকে ভেল্কিটা দেখায়ে দাও।

রুক্মিণীরও কৌতুকের সীমা ছিল না। সে বলেছিল, আপনি হুকুম দিলেন তো ?

রাজাও কৌতুকভরে বলেছিলেন, দিলাম।

খাঁচার ভিতর বাঁটুলীর প্রিয় খাদ্য সর গুড় আর মাংস দিয়ে রুক্মিণী তুড়ি দিয়ে ডেকেছিল, বাঁটুলী, আয় আয়—বাঁটুলী—

বাঁটুলী একবার অপাঙ্গে হাউইয়ের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় তাকে ইঙ্গিত করেই মাটিতে নেমে পায়ে পায়ে হেঁটে গিয়ে খাঁচার দরজার মুখে মুখ পুরেছিল। ওদিকে হাউই চঞ্চল হয়েছে। রাজা তাকে ডাকলেন, হাউই, হাউই, এই, আয় আয়। কিন্তু হাউই তাঁর কথা শুনল না, সেও পায়ে পায়ে হেঁটে গিয়ে বড় খাঁচাটার মধ্যে বাঁটুলীকে অনুসরণ করে ঢুকে বসল।

সব মেয়েরা এবার খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

রাজা সেদিন সারাদিন থাকলেন। গান শুনলেন, নাচ দেখলেন। রুক্মিণীর সঙ্গে আলাপ করলেন। প্রসাদও খেলেন।

যাবার সময় রুক্মিণী খাঁচাটা তাঁর হাতে দিয়ে বললে, মালিক বাহাদুর, আপনি রাজা, আমি গরীব শুক্লীর মেয়ে, এককালে আমরাও ছিলাম শোলাঙ্কী রাজপুত। আজ আপদ্ধর্মে শুধু শুক্লী। বনে বাস করি। আমরা বনেই স্বাধীন হয়ে আছি। পৈতে নেই। আপনি তবু আমার ঠাকুরের প্রসাদ খেলেন, এ খাঁচা আপনাকে আমার নজরানা। বাঁটলীকে শুদ্ধ নিয়ে যান।

রাজা বলেছিলেন, ও নজরানায় তো মন ভরল না আমার।

—আর কি আছে আমার মালিক?

রাজা বলেছিলেন, ওই যে কিষণজী, তুমি তাঁর সেবিকা। আমি তাঁর সেবক। আমার নামও মাধব সিং। রুক্মিণী, যদি তোমাকে আমি তোমার বাঁটলীর সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই?

চুপ করে ছিল রুক্মিণী। সে ভাবছিল। সেকালে রাজাদের উপপত্নী রাখার কথা সে জানে। সমাজে দেশে সেটা সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু সেটা আভিজাত্যের লক্ষণ। কিন্তু সে বারো ভাইয়া শুক্লী সর্দারের মেয়ে—ছেলেবয়স থেকে এ সময় পর্যন্ত কিষণজীকে ভজনা করে এবং ওই সুরতিয়াবাঈয়ের কাছ থেকে রাজপুতানার গল্প শুনে এমনই একটি মন পেয়েছে, ভাবনা পেয়েছে, যাতে সে উপপত্নী হতে ঘৃণা বোধ করে।

—কি ভাবছ রুক্মিণী?

সে হাত জোড় করে বলেছিল, রাজা সাহেব, রুক্মিণী মাধবের গুণ শুনেই অনেক আগে থেকে মুগ্ধ। তবে সে তাকে কামনা করতে সাহস করে নি। মাধব যখন তাকে কামনা করেছেন তখন তার থেকে বড় ভাগ্য আর কি হতে পারে?

রাজা হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রুক্মিণী হাত সরিয়ে নিয়ে বলেছিল, তবু একটা কথা সে বলবে। উত্তর শুনবে।

—বল।

—রুক্মিনীর মাধবের কাছে মিনতি তাঁর চরণের দাসী যে হবে সে রুক্মিণী নাম নিয়েই হবে তো?

রাজা তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। উত্তর দিতে পারেন নি।

রুক্মিণীই বলেছিল, সত্যভামা জাম্ববতী ষোলশো মহিষী মাধবের ছিল। রুক্মিণীর তাতে তো বলবার কিছু নেই। কিন্তু সে তো নাম পাল্টাতে পারবে না হুজুর। রাধা ভাগ্য আমি চাই না রাজাবাহাদুর। তার থেকে আমি মীরাবাঈয়ের পথ ধরব।

রাজা তাকে বলেছিলেন, তুমি রুক্মিণী হয়েই যাবে রুক্মিণী।

রাজা মাধব সিং শুধু রাজা ছিলেন না, তিনি ছিলেন বীর, বড় শিকারী, দুর্দান্ত সাহসী। আর একটা কথা চলিত হয়েছিল যেটা লোকের মুখে মুখে চলে। সেটা হল—মরদ কি বাত

হাতীকা দাঁত। মর্দানী মাধব সিংকা—বাত দেতা তো জান দেতা। বাত কি খিলাপ কভি নেহি হোতা।

তিনি বিয়ে করেই নিয়ে গিয়েছিলেন রুক্মিণীকে। বাধা পড়েছিল অনেক। কিন্তু সে বাধা তিনি মানেন নি। মুর্শিদাবাদে তখন নবাব সুজাউদ্দীনের আমল। সুজাউদ্দীন যখন উড়িষ্যা থেকে মুর্শিদাবাদে বসতে চলেছিলেন তখন মাধব সিং তাঁকে নজরানা পেষকষ পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু নিজে যান নি। তার কারণ তিনি বলেছিলেন, ছেলের সম্পত্তি যে কেড়ে নেয় সে বাদশাহী সনদে নবাব হয়েছে বলে নজরানা পাঠাচ্ছি, কিন্তু সেলাম দিতে যাব কেন? এমনই চরিত্রের লোক। সুতরাং যে কথা তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন রুক্মিণীকে, তা তিনি রেখেছিলেন।

রাজার আরও তিন বিয়ে ছিল। তিনটিই ছত্রি রাজার কন্যা। এ ছাড়াও উপপত্নী ছিল। উপপত্নীতে রাণীদের আপত্তি ছিল না। কিন্তু এই পৈতে ছাড়া পোশাকী রাজপুত শুক্রী সর্দারের মেয়েকে বিবাহে তাদের প্রচণ্ড আপত্তি হয়েছিল। ছত্রি মনসবদার ব্রাহ্মণ দেওয়ান এবং অন্যান্য ছত্রিদেরও আপত্তি ছিল প্রবল। শেষ পর্যন্ত নতুন শুক্রী রাণীর জন্য আলাদা মহলের ব্যবস্থা করিয়ে তবে তারা সম্মতি দিয়েছিল। রাজা জেদ ছাড়েন নি। জেদ বজায় থেকেছিল কিন্তু বিয়েতে ছত্রি এবং ব্রাহ্মণেরা এসেই চলে গিয়েছিল সামান্য ফলমূল মিষ্টান্ন খেয়ে। বিয়ে হয়েছিল চন্দনগড়ে। দলু সর্দার কন্যা নিয়ে গিয়েছিল। তার ভাইরা যায় নি, ছেলে পাঠিয়েছিল। কিন্তু বাহাদুর-ঘরিয়া গিয়েছিল, দশাস্বীরাও গিয়েছিল। আর গিয়েছিল বাগদী পাইকরা।

বিয়ে হয়ে গেল। রাজা ভেবেছিলেন লড়াইয়ে তিনি জিতলেন। কিন্তু বিয়ের পর দেখলেন, না, তিনি জেতেন নি, লড়াই লেগে রয়েছে এবং প্রথম দফায় তিনি জিতেছেন একথা সত্য হলেও দ্বিতীয় দফার জন্য প্রতিপক্ষরা দস্তুরমত লড়াই সাজিয়ে রেখেছে। রাজা দেখলেন—আলাদা-মহলে বাস করার জন্য রুক্মিণী রাণীর মর্যাদা পাচ্ছে না।

মাধব সিং জেদী, দুর্দান্ত জেদী। কিন্তু তার থেকেও সমবেত জেদ আরও কঠিন, আরও শক্তিশালী।

গৃহদেবতা রাধামাধবের পুরোহিত বললে, পর্বে-পার্বণে রাণীদের কাজ আগের রাণীরা করবেন। নতুন রাণীকে করতে দেব না—এ হতে পারে না।

অন্য রাণীরা, দেওয়ান এবং ছত্রিরা তাতে সায় দিলে। এদের মূল শক্তি মনসবদার সুচেত সিং—বড় রাণীর সহোদর।

রাজা কি করতেন তা বলা যায় না, কিন্তু রুক্মিণী এর সমাধান করলে। বললে, তুমি আমার কিরণশ্রীকে এনে দাও, আমার এখানে তাঁকে স্থাপন কর। তাঁকে পূজো করলেই তোমার বংশের ঠাকুরকে পূজো করা হবে। আর এ সমস্যার সমাধানও তিনি করে দেবেন।

রাজা খুশী হলেন। তাই হোক। খবর পাঠিয়ে তিনি শ্বশুর দলু সর্দারকে আনিয়ে বললেন সমস্ত। তারপর বললেন, সর্দার, রুক্মিণীকে রক্ষা করতে একলা আমি। আমার ভয় হচ্ছে এরা কোন দিন—

হেসে বললেন, নিজের জন্তে ভাবি নে কোনদিন। কিন্তু রুক্মিণী ?

রুক্মিণী বলেছিল, তার জন্তে তুমি ভেবো না রাজা। যাবকার কিষণজী দেহত্যাগের আগেই রুক্মিণী বৈকুণ্ঠে চলে গিয়েছিলেন।

দলু বলেছিল, তুমি রাজা, তবু আমার জামাই। আমাদের বহু পুরুষ আগে হারানো সম্মান তুমি দিলে রুক্মিণীকে বিয়ে করে। যদি কিছু বাসের জায়গা আমাদের দাও তবে আমার পৈতৃক পঁচিশ ঘর পাইক এখন চল্লিশ ঘর হয়েছে, তাতে মরদ পাইক এখন দুশোর উপর—তাদের নিয়ে এখানে আমি চলে আসি, বাস করি। কাজ করি। দুশো পাইকের জান থাকতে তোমাদের কেউ ছুঁতে পারবে না।

মাধব সিং সানন্দে মত দিয়ে বলেছিলেন, তুমি শ্বশুর, তোমার সঙ্গে বাপ বেটার সম্পর্ক হয়েছে। তোমাকে আমার প্রণাম। যাও, নিয়ে এস পাইকদের যত জলদি হয়।

ওদের কিস্তীর উত্তরে মাধব সিং ঘোড়া তুলে কিস্তীটাই শুধু ঢাকলেন না, তাঁর ফিলের মুখে উঠ-কিস্তী পড়ে গেল। মাসখানেকের মধ্যে চন্দনগড়ের পাশটায় যে জঙ্গলটা ছিল সেই জঙ্গল কেটে বসে গেল নতুন পাইকরা। চন্দনগড়ের শক্তিবৃদ্ধি হল। চল্লিশ ঘর নয়, এল ষাট ঘর। বাহাদুর-ঘরিদের তাঁবে থেকে বিশ ঘর পাইক দলুসর্দারের দলভুক্ত হয়ে ষাট ঘরের তিনশো জোয়ান এসে নিজেরাই নিজেদের ঘরদোর সব গড়ে নিল।

তারপর হঠাৎ একদিন বিপদ বাধল আবার। ঠিক এক বছর পর মারাত্মক কিস্তী পড়ল। কটকের শাসনকর্তা সুজাউদ্দীনের জামাই রুস্তম জং-এর দরবার থেকে পত্র এল। মীর হবিব রুস্তম জং-এর দেওয়ান। সুজাউদ্দীনের ছেলে তকী খাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে নবাবের জামাই রুস্তম জং উড়িষ্যার নায়েব নাজিম হয়েছে, মীর হবিব তার দেওয়ান। তিনি লিখেছেন পত্র :

"সুবা বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব সুবাদার সতোমগন উল্‌মুল্ক সুজাউদ্দীন আসদ জং বাহাদুরের প্রতিনিধি উড়িষ্যার নায়েব নাজিম মহামান্য আমীর উলমুল্ক মুর্শিদকুলী রুস্তম জং বাহাদুরের আদেশক্রমে এই হুকুম-নামা চন্দনগড়ের রাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত মাধব সিং সাহেবের উপর জারী হইতেছে। নায়েব নাজিম বাহাদুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে ইহা অকাট্য সাচ্চা খবর বলিয়া ধরা পড়িয়াছে যে, আট নয় বৎসর পূর্বে এক শুকী সর্দার—দলপৎ শুকী বিষ্ণুপুর রাজদরবারের আশ্রিত এক সুরতিয়াবাঈকে ভুলাইয়া অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। এই শয়তান সর্দার অতি ব্যভিচারী এবং ডাকাতিই তার একমাত্র পেশা। এই সুরতিয়াবাঈ প্রথম জীবনে হিন্দু থাকিলেও বাঈ হইয়া সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সুরতিয়াবাঈকে যখন দলপৎ অপহরণ করে তখন তাহার সঙ্গে তাহার এক পালিতা বা আপন কন্যা ছিল। সেও পবিত্র ইসলামের আশ্রিতা মুসলমানী সুরতিয়ার কন্যা, সেও মুসলমানী। সেই কন্যা সুরতিয়ার মৃত্যুর পর হইতে দলপতের কাছে ছিল। সে তাহাকে কন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। এবং রাজা মাধব সিং সমস্ত জানিয়া বা না জানিয়া তাহাকে আপনার উপপত্নী করিয়া রাখিয়াছে। ইহার তুল্য ইসলামের অপমান কি হইতে পারে ? সুতরাং নায়েব নাজিম বিচারক-শ্রেষ্ঠ রুস্তম জং-এর হুকুম, অবিলম্বে ওই কন্যাসহ রাজা মাধব সিং উড়িষ্যায় আসিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবেন। অথবা ওই কন্যাকে উপযুক্ত মর্যাদার সহিত নাজিমের মহলে পাঠাইয়া দিবেন।

অন্যথায় উড়িষ্যার নবাবী ফৌজ চন্দনগড় ভূমিসাৎ করিয়া ইসলামের অপমানের শোধ লইবে।"

রাজা মাধব সিং জ্বলে উঠেছিলেন। তবুও নিজের মর্যাদা, এবং রাজ্যের বিপদের দিকে লক্ষ্য রেখে পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলে দেন নি। উত্তরে নিজে হাতে পত্র লিখে দিয়েছিলেন। সংক্ষিপ্ত পত্র: "যাহার তরবারির শক্তি আছে, সঙ্গে বহু অনুচর আছে, তিনি খেয়ালমত আলোর রঙকে কালো বলিলে উত্তরে কোন দুর্বল মানুষ কোন প্রমাণ দিয়া প্রমাণ করিতে পারে না যে, আলো কালো নয়, আলো সাদা। যে অভিযোগ করা হইয়াছে—তাহা কোন শয়তান আমার এবং আমার বিবাহিতা পত্নীর অনিষ্ট কামনায় নায়েব নাজিমের দরবারে হাজির করিয়াছে। বিনা প্রমাণ প্রয়োগে বিচার করিতে পারেন একমাত্র ঈশ্বর, খোদাতায়লা। নায়েব নাজিম সূক্ষ্ম বিচারক ন্যায়বান হইলেও তিনি ঈশ্বর নহেন। সুতরাং প্রমাণ প্রয়োগ গ্রহণ করার পূর্বে কোন আদেশদান হইতে পারে না। এই কন্যার নাম রুক্মিণী, সে দলপৎ শুক্লীর কন্যা, সুরতিয়াবাঈ পুরী যাত্রার পথে দলপৎ রায়ের গ্রামে দুই বৎসর সাত মাস থাকিয়া তাহাকে নৃত্যগীত শিখাইয়াছিলেন। সুরতিয়াবাঈও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। পুরী মন্দিরে তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। আমাকে যে কোন অজুহাতে ধ্বংস করা উদ্দেশ্য হইলে স্বতন্ত্র কথা। অন্যথায় নবাব ইহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া আশা করি।"

অন্দর মহল থেকে রাজসভার রাণী ও সরকারী কর্মচারীরা এ উত্তর শুনে বেঁকে দাঁড়িয়ে বলেছিল, একি কথা! নবাব দরবার থেকে যে অভিযোগ এসেছে সে মিথ্যা হবে কি করে!

সাধারণ প্রজারা নবাবী ফৌজ রাজ্য আক্রমণ করতে পারে জেনে ভীত হয়েছিল।

রাজা মাধব সিং রুক্মিণীকে কাছে ডেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, কোন ভয় নেই।

দলু সর্দারের দল অহরহ প্রস্তুত হয়ে থাকতে শুরু করেছিল। মেয়েরা তাদের পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে রেখেছিল, পুরুষেরা লড়াই শুরু করলে তারা বনে ঢুকে বসবে। দলু সিং সর্দারের বাগ্দী নায়কেরা আরও পাইক সংগ্রহ করে এনেছিল। সবসুদ্ধ মিলে তারা তখন পাঁচশো। তারা দুর্দান্ত, তারা মরীয়া। তাদের কাছে রাজ্যের ছত্রি এবং চুয়াড় সৈন্য হীনবল হয়ে পড়েছে। তারাও সংখ্যায় শ পাঁচেক।

রাজা, দলু এবং রুক্মিণী সকলেই বুঝতে পেরেছে—এ সবই বড়রাণী এবং তার ভাই সুচেত সিং-এর ষড়যন্ত্র। রাণী দুহাতে টাকা ছড়াচ্ছেন গোপনে।

রাজা মাধব একটা অন্যায় করেছিলেন। রুক্মিণীকেই তিনি সব করে তুলেছিলেন তাঁর জীবনে। অন্য রাণীদের মহলে যেতেন না। ঠাকুর-বাড়িতে গিয়ে বাইরে থেকে প্রণাম করে চলে আসতেন। নিমন্ত্রণ কাউকে করতেন না, কারুর বাড়িতে নিমন্ত্রণে যেতেনও না।

তিনি দলুকে মধ্যে মধ্যে ডেকে পরামর্শও করতেন যে একদিন রুক্মিণীকে এবং সর্দার আর পাইকদের নিয়ে চন্দনগড় ছেড়েই চলে যাবেন দুর্গম অরণ্যের মধ্যে। সেখানে নতুন করে গড়ে তুলবেন নতুন রাজ্য। কিন্তু রুক্মিণী প্রায় আসন্নপ্রসবা। একমাস দেড়মাসের মধ্যেই তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথা। প্রতীক্ষা করছিলেন সেই সন্তান প্রসবের।

রুক্মিণী কখনও কখনও ছুরি নিয়ে খেলা করত। রাজা মাধব সিং হাত থেকে ছুরি কেড়ে নিতেন। অবশেষে তাকে একদিন কিষণজীর সামনে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, সামনে

কিষণজী, একটা সত্য কথা বলবে রুক্মিণী ?

—কি ?

—ছুরি নিয়ে যখন খেলা কর তখন কি ভাবো ?

রুক্মিণী চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কথা বলে নি।

—রুক্মিণী !

এবার রুক্মিণী কেঁদেছিল। রাজা তাকে বুকে নিয়ে বলেছিলেন, একটা শপথ করতে হবে তোমাকে।

—বল।

—যতদিন তোমার গর্ভে আমার বংশধর রয়েছে ততদিন এসব ভাববে না।

সে বলেছিল, ভাবব না।

ঠিক তার পরদিনই সংবাদ এসেছিল মীর হবিব আসছেন সরজমিন তদন্ত করবেন। রাজা শঙ্কিত হয়ে দলুকে বলেছিলেন, কোন্ পথে কোন্ দিকে চন্দনগর ছেড়ে যাবে খবর ঠিক করে রাখ। ডুলি ঘোড়া এসব যেন অষ্টপ্রহর তৈরি থাকে। মীর হবিব বাঘ নয়, সে সাপ।

তবে নবাবী চিঠির সুর এবার ভাল। পত্রে আছে: "নায়েব নাজিম সহিষ্ণু এবং সূক্ষ্ম বিচারক। তিনি রাজা সাহেবের নির্ভীক পত্রে অসন্তুষ্ট হন নাই, তুষ্টই হইয়াছেন। একটা সংবাদ ইতিমধ্যেই পাইয়াছি। সুরতিয়াবাঈ সত্যই শেষ জীবন পুরীতে অতিবাহিত করিয়াছে। এবং সে বলিত তাহার কেহ নাই। রাজা সাহেবের অন্য কথাগুলিও বিশ্বাসযোগ্য। তবুও তদন্ত না করিলে সূক্ষ্ম বিচার করা যায় না। সেহেতু নায়েব মীর হবিব আমীর সাহেব যাইতেছেন। সঙ্গে তাঁহার এক শতের বেশী সিপাহী থাকিতেছে না। সুতরাং কোন আশঙ্কা করিবেন না। জানি, রাজা সাহেব সাহসী এবং ধীর ব্যক্তি। রুস্তম বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে।"

তবু রাজার সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু কিছু করার তো উপায় ছিল না। রাজ্যে কিন্তু অসন্তোষকে তখন প্রবল করে তুলেছে মাধব সিং-এর মনসবদার বড় রাণার ভাই সুচেত সিং। দিন দিন নানা গুজব রটছে। 'একশো সিপাহী নিয়ে আসছে মীর হবিব কিন্তু তার পিছনে আসছে পাঁচ হাজার পল্টন আর তোপখানা। রাজা মুসলমানী বাঈয়ের মেয়েকে না দিলে একেবারে সব ভূমিসাৎ করে দিয়ে যাবে। ও মেয়ে মুসলমানী।'

'রাজার পুরুত রাধামাধবের পূজারী বলছে, দেবতা বিমুখ হয়েছে। পূজোর ফুল পায়ে থাকে না, পড়ে যায় মাটিতে। ভোগও নাকি হয় না। ভোগের উপর তুলসী পাতা দিতে গেলে হাত থেকে খসে মাটিতে পড়ে যায়।' তবু মাধব সিং অটল রইলেন। দাঁড়িয়ে থেকে একদিন পূজো দেওয়ালেন, পূজো করালেন। ভোগ দেওয়ালেন। সেদিন কিছু হল না, ফুলও পায়ে থাকল, তুলসীপাতাও ভোগের মাথায় থাকল। তবু গুজব ফিরতে লাগল। দলপৎ সিং-এর পাইকরাও অহরহ তৈরি হয়ে ঘুরতে লাগল। রাজা অন্য সিপাহীদের টাকা দিলেন একটা উপলক্ষ করে। সুচেত সিংরা চুপ হয়ে গেল। রাজা বললেন, দেখ, আসুক মীর হবিব। হোক তদন্ত।

মীর হবিব এলেন। তাঁর তাঁবু পড়ল গ্রামের বাইরে। সিপাহী একশোর বেশি নয়। তোপ নেই। হবিবকে অভ্যর্থনা করলেন রাজা। হবিব খুব কেতাদুরস্ত আমীর। কথাবার্তায় ভারী পারঙ্গম।

দলু সর্দার সঙ্গে যায় নি। মাধব সিং তাকে রুক্মিণীর ভার দিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। রাজার বুদ্ধি ছিল খুব তীক্ষ্ণ। অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেতেন, এ কথা দলু জানত। তবে দলু বার বার বলেছিল, তুমি বল রাজা সাহেব, একদিন রাত্রে সুচেত সিংকে কেউ শেষ করে দিক। কিন্তু রাজা তা দেন নি। বলেছিলেন, কতজনকে খুন করবে শ্বশুর? বড়রাণী? সে যে বুকে বিঁধে আছে। আর দুই রাণী? তারা? স্ত্রী হত্যা কি করে করব? করতাম ব্যভিচারিণী হলে, কিন্তু সে অপরাধ তো তারা করে নি।

চুপ করেছিল দলু। হাঁ, ঠিক বলেছে জামাই। রাজনিচার! রাজবুদ্ধি!

সেদিন রাজার সঙ্গে ছিল গণেশ পাইক আর ভীম পাইক ডাইনে বাঁয়ে। পিছনে ছিল বিশজন পাইক একটু দূরে।

হবিব আমির রাজাকে বসিয়ে হেসে বলেছিল ফার্সী বয়েৎ। তারপর বলেছিল, এ হল দেওয়ানা কবি হাফেজের বয়েৎ রাজা সাহেব। অর্থ হল—হাফিজ বলেছিল তাঁর যে প্রিয়া তার গালে একটি তিলের জন্য তিনি বোখারা সমরকন্দ দিয়ে দিতে পারেন। তুমি রাজা সাহেব তেমনি দেওয়ানা, যোহব্বতিতে দেওয়ানা আদমী।

রাজা বলেছিলেন, আমীর সাহেব, আপনি পারদর্শিতে পণ্ডিত, রসিক লোক। কিন্তু রুক্মিণী আমার বিবাহ করা ধর্মপত্নী।

—সগাই?

—না, শাদী।

—আচ্ছা। তা হলে তোমার মুল্লুক জুড়ে এমন চেল্লায় কেন?

—কেউ চেঁচায় না। সুচেত সিং আর তার বোন চেঁচায়। তার বোন, আমার প্রথম স্ত্রী।

হা-হা করে হেসে হবিব বলেছিলেন, সতীনের কাণ্ড! ঔরতি গোস্তা! তা হতে পারে। তবে মীর হবিবের পরখ একটি। এক পরখেই সে ঠিক ধরে নেবে—সত্যিটা কি। এক পরখ।

রাজা বলেছিলেন, বেশ, পরখ করুন।

একটু চুপ করে থেকে হবিব বলেছিলেন, জানেন রাজা, গুলাব তামাম মুল্লুকেই এখন ফোটে। কিন্তু বসরাই গুলের কাছে কেউ না। সে ধরবার ক্ষমতা কজনের? সবাই দেখে এক গুলাব। কিন্তু যার বাড়ি বসরা সে ঠিক ধরে দেবে—এ গুলাব বসরাই কি বসরাই নয়।

রাজা সাহেব চমকে উঠে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন।

হবিব বলেই চলেছিলেন, দেখিয়ে রাজা সাহাব—এ তো আপনি মানবেন যে এতকাল আপনারা রাজপুতানার রাজপুত শেষ এই বাঙ্গালে ভাত মুড়ি আর মচ্ছির মুল্লুকে বাস করছেন। তবু আপনাদের রাজপুত ঔরতদের একটা আলাদা জলুস আছে, একটা ছাঁচ আছে। তরিবতে সহবতে চোখের চাউনিতে বাংলার কালী লেড়কীর সঙ্গে ফরক অনেক। তেমনি, ঠিক মুসল-

মান যারা ইসলামি একটা ছাঁচ একটা গড়ন একটা তরিবৎ থাকবেই। যতই হিন্দুয়ানির রঙ দিয়ে ঢাকুক সে ঢাকা যায় না। মুসলমানী বেটী আমি এক নজরে ধরতে পারি।

রাজা উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠেছিলেন, হবিব সায়েব! অর্থাৎ রাজা বুঝেছিলেন হবিব সায়েব এর পর বলবে রুক্মিণীকে এর পর হাজির করা হোক। উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

হবিব চিৎকার করে উঠেছিল, এও বেওকুফ্, বে-তরিবৎ জংলী রাজপুত, বৈঠ যাও।

রাজা ডেকেছিলেন, ভৈরব! ভীম! গণেশ! চলো।

হবিব সাহেব চিৎকার করেছিলেন, সি-পা-হী লোক! ম-ন-স-ব দার!

সব তৈরিই ছিল। কিন্তু বোধ হয় কিছু আগে ঘটে গিয়েছিল। কিছু পরে হবার কথা ছিল। হবিবের সিপাহীরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রাজা এবং ভীম ভৈরবদের উপর। রাজা লড়াই করতে করতে চেঁচিয়ে বলেছিলেন, একজন যাও, খবর দাও দলুকে, রুক্মিণীকে।

বলতে বলতে তিনি পড়েছিলেন।

ভীম আর গণেশ ফেরে নি। ভৈরব ফিরেছিল,—সর্দার, সর্বনাশ, সব শেষ!

এরপর কি করতে হবে রাজা তা আগেই বলে রেখেছিলেন দলপৎকে। রুক্মিণীকে তিনি বাঁচাতে বলেছিলেন। তিন রাণীর মধ্যে কারুর পুত্রসন্তান নেই, সব কন্যা। রাজা বলেছিলেন রুক্মিণীর গর্ভে যদি বংশধর থাকে? ওকে বাঁচিয়ো খণ্ডর। তোমার আমার দুজনের জলপিণ্ড। এখানে সুচেত সব বিষিয়ে দিয়েছে। ওরা তোমাদের মারবার চেষ্টা করবে। পালিয়ো—যে কোন উপায়ে পালিয়ো। দুর্গম বনে। গভীর বনে। যে ভাবে তোমার দাদো পালিয়েছিল। তাদের সঙ্গে তুমি বেঁচো। নইলে রুক্মিণীর পালানোর মানে হয় না। নিজেদের পুরনো বনে ফিরে যেয়ো না, সেখানে ওরা তোমাদের পাত্তা করবে। নতুন দুর্গম বনে চলে যেয়ো।

দলপতের হুকুমে পাঁচশো জোয়ানের চারশো দিয়েছিল লড়াই। আর দলপৎ নিজে মেয়েছেলে, গরু, ঘোড়ার পিঠে নিতান্ত দরকারী জিনিস এবং ডুলিতে রুক্মিণীকে চাপিয়ে ঢুকে পড়েছিল বনে। সঙ্গে একশো জোয়ান, বাদবাকি মেয়ে বুড়ো আর বাচ্চা। সেই আসছিল তারা। বন থেকে বনে, গভীর বনে বনে, নালা চিবি পার হয়ে চলে আসছিল। সেদিন ছদিন পুরো হয়ে তিন দিনে পড়েছিল। তিন থাকি হয়ে চলেছে তারা। সামনে বিশ জোয়ান আর সে। তাদের সঙ্গে ডুলি আর ঘোড়ার পিঠে গরুর পিঠে জিনিসপত্র, তার সঙ্গে বাচ্চা বুড়ো আর রোগা লোক। তার কিছু পিছনে শক্তসমর্থ মেয়েরা। তাদের পিঠে জিনিস, কারুর পিঠে কচি বাচ্চা। তাদের সঙ্গে পঁচিশ জোয়ান। একেবারে পিছনে পঞ্চাশ জোয়ান। যারা পিছু নেবে—তাদের সঙ্গে প্রথম লড়াই তারা দেবে। হাঁকবে। মাঝের জোয়ানেরা ঘাঁটি গাড়বে। তাদের সঙ্গে শক্ত মেয়েরা। তারাও বাঁটুল ছুঁড়তে জানে, তীর ছুঁড়তে জানে।

এদিকে সামনের দল ডুলি আর মেয়েদের পিছনে রেখে আর একটা ঘাঁটি পাতবে, নইলে চেষ্টা করবে আরও গভীর বনে ঢুকবার। পঞ্চাশ জোয়ান যারা সবার পিছনে আসছিল—প্রথম লড়াই দেবার জন্যে তারা কেউ ফেরে নি। লড়াই দিয়ে তারা মরেছিল। বাকিরা ঢুকেছিল গভীর বনে।

দুই

বিশ বছর আগেকার কথা। তিন দিনের শুরুতে আবার এল বাধা, বিকেলবেলা প্রসব বেদনা উঠল রুক্মিণীর। খুব জোর কদমে হেঁটে সামনে পাহাড় দেখে থামতে হল। একজন লোকও ফিরে এল। একটা জোড় অর্থাৎ ছোট নদী পাওয়া গেছে। আস্তানা পড়ল। কাপড় ঘিরে ঘেরা দিয়ে রুক্মিণীকে নিয়ে অম্বিকে বাগ্দিনী আর দলপতের বিধবা বোন অহল্যা ঢুকে বসল। লোকেরা চিঁড়ে ভিজিয়ে খেলে। আটটা গরুর পিঠে শুধু চিঁড়ে বোঝাই ছালা নিয়েছিল দলপৎ। দুটো ছালায় ভেলি গুড়। লোকজনেরা খেয়েদেয়ে শুল। মদ নেই। মদের জন্ত প্রাণ হাইফাই করছে। পথে কিছু শিকার হয়েছে—দুটো বড় সম্বর হরিণ। তার চামড়া ছাড়িয়ে দুপুরে আগুন করে পুড়িয়ে নিয়ে খেয়েছে। নুন নেই। নুনের টিন ফেলে এসেছে। পাঁচ-সাতটা গাইয়ের দুধ আছে। ছেলে আর রোগারা খেয়েছে। রুক্মিণী খেয়েছে। আর পথে পেয়েছে গোটা দশেক মধুর চাক। এ দুদিনের মধ্যে চন্দনগড়ে কি ঘটেছে তার খবর তারা পায় নি। তবে পিছন কেউ নিতে পারে নি। তারা উড়িষ্যার এলাকার দিকে যায় নি। পুরীর পথকে বাঁ পাশে রেখে বনে বনে চলেছে। এলাকা বাংলোর—সে দলপৎ চেনে। ঠিক করে নি কোথায় যাবে। তবে চলেছে। রুক্মিণীকে বাঁচাতে হবে আর তার বাচ্চাকে। মাধব সিং বলে গেছে, খুশুর, বেটাছেলে হবে আমার বিশ্বাস। আমার তোমার দুজনের বংশধর, জলপিণ্ডের আধার। তাকে যেখানে হোক গিয়ে বাঁচাতে হবে।

সারাটা রাত্রি গাছের তলায় বসে। সে কি করবে? রুক্মিণীর এক একটা কাতরানি ভেসে আসছিল আর বুকটা ধ্বক ধ্বক করে উঠছিল। সে চুপ করলে কি করবে ভেবেই যাচ্ছিল ঘটনাগুলো। দুদিনের মধ্যে ভাববার অবকাশ ছিল না। ভাবতে পায় নি। রাজার দেহটা? আঃ, কেউ ফিরল না? যাক্, যাই হোক বাবা, রাজা মাধব সিং, তুমি ক্ষমা করো। তোমার বংশধর আর রুক্মিণীকে বাঁচাতে তোমার দেহ উদ্ধার করে সৎকার করতে পারলাম না। আসুক, আজ তোমার বংশধর আসুক। ওই কাতরাচ্ছে রুক্মিণী। সে আসছে। সে করবে তোমার সৎকার।

তখন জোয়ান বয়স দলুর, তখনও সে নোয়ায় নি, সোজা ছিল। চামড়া কোঁচকায় নি। দু-চার গাছা চুল পেকেছে। পাকুক, না হলে দাদো বলে মানাবে কেন? দাদো হয়ে সে এখনও পঁচিশ বছর পার করবে। তোমার বাচ্চা ষোল বছরের হলে তার হাতে তোমার তলোয়ার দিয়ে সে তলোয়ার ছাড়বে। দলপতের পাশে যে তলোয়ারখানা রয়েছে সেখানা মাধব সিং তাকে দিয়েছিলেন। যেদিন সে চন্দনগড়ে এসে তার পাইকদল নিয়ে রাজার পল্টন-ভুক্তান হল সেই দিন। আর রুক্মিণীর কাছে আছে তোমার ছোরা। তারপর তাকে দিয়ে তোমার সৎকার করাব। গয়াধাম নিয়ে যাব। আর?

ঝিঁঝি ডাকা রাত্রির বনে ঝিঁঝির ডাক ঢেকে দিয়ে পাখিরা ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ও কি শব্দ? একটা কাতর আর্তনাদ রুক্মিণীর। তার সঙ্গে ও কি! শিশুর কান্না! পাখির ডাকে ঢাকা পড়ল।

চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এল অহল্যা। জয় কিষণজী! জয় কিষণজী! জয় কিষণজী!

—অহল্যা! চিৎকার করে উঠল দলপৎ।

অহল্যা বললে, শিঙাটা বাজা রে দাদা, শিঙাটা বাজা।

—কি হল বল্?

—কালা হয়েছিস? শুনছিস নাই চেল্লানি। কি চেল্লানি, কি চেল্লানি! বাপ রে বাপ। মার্ মার্ করছে যেন! বাজা, শিঙা বাজা, সবকে তুল্।

—ছেলে হল?

—আঃ, সাত কাণ্ড রামায়ণের বাদে বলে সীতে কে? বললাম নাই চেল্লানির কথা! শুনছিস নাই?

হ্যাঁ, ছেলে চিৎকার করে কাঁদছে। চিৎকারে কান্নার বিলাপ নেই, রোষ রয়েছে যেন। হাসিতে ভরে উঠল দলপতের মুখ।

অহল্যা দুই হাতে একটা মাপ দেখিয়ে বললে, অ্যাই ছেল্যা, এই হাতের বাই। সদল বদল—

—কি ছেলে রে?

—কি আবার! বেটাছেলে না হলে অহল্যে চেল্লায়? শিঙা বাজাতে বল্। লে, শিঙা বাজা।

—না। শিঙা বাজালে সব ধড়মড়িয়ে উঠবেক। মনে করবেক কে কোথা দুশমন আইচে। সে গোলমাল হবেক। হবে, বাজবে শিঙা, বাজবে নাকাড়া, বাজবে ঢোল—সে দিন আসবেক। আজ লয়। জয় কিষণজী! জয় কিষণজী! জয় গোপাল! জয় যোগমায়া! জয় রাধামাধব! না, রাধামাধবের নাম সে করবে না। রাধামাধবের মন্দিরে রুক্মিণী ঢুকতে পায় নি। জয় কিষণজী! জয় গোপাল! জয় যোগমায়া। তোমার বাচ্চার মঙ্গল করো। হে বনের দেবতা, তুমি মঙ্গল করো।

উপরের দিকে সে তাকালে। আকাশ ফরসা হয়েছে। ওইটা পুব দিক। গাছের ফাঁকে ফাঁকে লাল বরণ দেখা যাচ্ছে। পুবে সূর্য উঠছে। পশ্চিমে বন—কেবল বন, কেবল বন, দক্ষিণ-পশ্চিমে পাহাড়গুলো এখনও কালো দেখাচ্ছে। আকাশের গায়ে মেঘের মত।

সে উঠল, কালকের লোকেদের কাটা ডালগুলোর ইশারা ধরে যাবে সে নদীর ধারে। তার আগে সে ডাকলে, ভূপালে, এ ভূপালে উঠ্। জেগে বস্। শুনছিস? রুক্মিণীর ছেল্যা হল রে শুয়ারের। উঠ্। আমি আসছি।

আর একবার তাকালো সে রুক্মিণীর প্রসবস্থানের ঝোপটার দিকে। গাছতলাটা সুন্দর। গাছটাও প্রকাণ্ড শাখী গাছ। অর্জুন গাছ। ঠিক হয়েছে। রুক্মিণীর বেটার নাম হবে অর্জুন সিং। আচ্ছা নাম।

কিষণজীর দোস্ত অর্জুন। বহুৎ আচ্ছা হয়েছে।

[ক]

ভোরবেলা সে মুখ হাত ধোবার জন্যই ছোট নদীটির সন্ধানে ওই কাটা ডাল ফেলা বনতল দেখে ঘাটে গিয়ে পৌঁছল। ঘন বনের মধ্যেই নদীটি বয়ে যাচ্ছে। পাথুরে বালিতে ভরা নদীবক্ষের উপর দিয়ে কাচের ধারের মত জল তরঙ্গময় হয়ে উঠে প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। এখন জল কম। অনেক বড় বড় কালো পাথরের মাথা উঁচু হয়ে বেরিয়ে রয়েছে। জলের দিকে তাকিয়ে দেখলে, স্বচ্ছ জলের তলার পাথরগুলি সুন্দর গোলালো, নানা আকারের, নানা রঙের। কিছু কিছু পাথরের মাঝখানে সাদা সরু একটি বা দুটি দাগ পৈতের মত বেড় দিয়ে রয়েছে। দলু সর্দারের সম্ভ্রম হল। এ তো সবই শিব ঠাকুরের জাতের পাথর। নদীটিকে তার পুণ্যময়ী বলে মনে হল। সে খানিকটা জল মাথায় নিয়ে হাত জোড় করে বললে, মা, তুমি নিশ্চয় কোন শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা। কোন শাপ শাপান্তে নদী হয়েছ। স্বর্গে শিবপুজো করতে নিত্য, সেই পুণ্যে শিবঠাকুর তোমার কোলে হাঙ্গর লাখ হয়ে তোমার ছেলের মত খেলা করছে। মা, আমি খুব বিপন্ন। আমার জমোইকে মেরেছে অন্যায় করে। আমার মেয়েকে নিয়ে বলে বনে ঢুঁড়ছি। কোথায় নিরাপদ ঠাঁই পাব যেখানে দুশমনেরা খোঁজ পাবে না। পেলেও তোমার মত দেবতার দয়ার বেড়া ঠেলে আমাদের নাগাল পাবে না। দয়া কর মা!

হঠাৎ একটা গর্জনে চমকে উঠল দলু। এ কি! মা রাগ করলে! ওপারে একটা পাথরের উপর একটা বাঘ দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। সর্বনাশ! বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে ওস্তাদ বংশের ছেলে দলপৎ, শোলাঙ্কী রাজপুত ভয় খায় না। কিন্তু তার হাতে যে কিছু নেই বললেই হয়। একটা ভোজালী শুধু। সে অবশ্য পালাতে পারে। এখনও ওটা নদীর ওপারে। এক লাফে নদীটা পার হতে পারবে না। শয়তান ডোরা নয়, চিতা। কিন্তু ছুটলেই বেটা লাফ দিয়ে নদী পার হয়ে পিছু নেবে। এবং গিয়ে হাজির হবে ওদের আস্তানায়। রুক্মিণীর ছেলে হয়েছে। একটা সোরগোল হৈ-চৈ হবে। ভয় পাবে রুক্মিণী বাচ্চার জন্যে। ধাঁ করে একটা মতলব তার এসে গেল। সে যদি নদীর ধার ধরে আস্তানাকে দূরে পিছনে রেখে এগোয় তো কি করবে বেটা? বেটা কি তার সঙ্গে সঙ্গে জিভ চাটতে চাটতে ওপার ধরে চলবে না? তারপর দূরে গিয়ে যা হয় বোঝাপড়া ওর সঙ্গে করবে দলু। একটা ভোজালীই যথেষ্ট, সে শোলাঙ্কী রাজপুত।

তাই সে করলে। ছুটে সামনের দিকে এগুলো সে যাতে আস্তানা দূরে পড়ে। হাঁ, ঠিক হয়েছে। তার মতলব হাসিল হয়েছে, বাঘটা একবার নদীতে নামবার উদ্যোগ করে আবার তীরে উঠে ঠিক দলুর সঙ্গে সঙ্গে চলল। দলু হেসে এবার বললে, আবে আও। আও মিয়া, আও। চলো, আওর থোড়া সামনে চলো। আওর থোড়া।

চলেছিল সে নদীর উজানে। ক্রমশ যেন বন মাটি উঁচু হয়ে উপরে উঠছে। নদীটা গভীর হয়েছে। সামনেই একটা জায়গায় উঁচু পাথরের গা বেয়ে নদীটা ঝোরার মত ঝর ঝর ঝরে

পড়ছে। নদীও সংকীর্ণ হয়েছে গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে। নদীর জল নিচে ঝরছে, নিচে এক-খানা পাথরের উপর পড়ে ছিটকে উপরে উঠছে, চারিপাশে ছড়াচ্ছে। কুয়াশার মত হয়ে বাতাসে ভাসছে। সে দাঁড়াল মুগ্ধ হয়ে। বাঘটাও ওপারে দাঁড়িয়েছে। দলু দেখতেই লাগল। ওঃ, অনেক—অন্তত পঁচিশ হাত নিচে পড়ছে জল। নদীগর্ভ প্রায় পঁচিশ হাত গভীর এখানে। নিচে জল যেন ভাতের হাঁড়ির মত ফেনায় ফেনায় টগবগ করে ফুটছে।

ওদিক থেকে 'ওঁও' শব্দ উঠল, বাঘটা শব্দ করছে। অর্থাৎ যেন বলছে কি বিপদ, লোকটা যে বিশ্রী জায়গায় দাঁড়িয়েছে। বেটার আর তর সইছে না। দলু বুঝতে পারলে এই ঝোরাটার কাছ থেকে সরলেই বাঘটা যা হোক একটা কিছু করবে। হয় লাফ দেবে, নয়—নয় কি করবে? নামবে নদীতে? কিন্তু সেই বা কি করবে? এইবার সোজা উলটো-মুখো পালাবে? আপসোস হল বর্শাটা না আনার জন্যে। তলোয়ারখানা আনলেও হত। হঠাৎ একটা খোঁত খোঁত শব্দে ওপারে বাঘের সামনের জঙ্গলটা নড়ে উঠল। বাঘটা চকিতে তার দিক থেকে সামনে দৃষ্টি ফিরিয়ে গর্জন করে লড়াই দেবার জন্যে দাঁড়াল যেন। দলু বুঝেছে, কিছু নয়, এক বুনো শুয়োর। ঝোপের মধ্যে ছিল, বাঘটাকে দেখে ক্ষেপেছে। সে নিশ্চিন্ত হল, সে খালাস। যা শত্রু পরে পরে। এবার বাঘটা পড়বে শুয়োরটাকে নিয়ে এবং ওই শুয়োরের মাংসেই আজ খুশি হবে। কিন্তু দুর্ধর্ষ শৌলাকী রাজপুতরক্তের কৌতূহল কম নয়। রক্তাক্ত জীবন-মরণের লড়াই দেখতে বিপুল উল্লাস। লড়াইটা তাকে দেখতেই হবে। সামনের ওই উঁচু জায়গাটা—যেখান থেকে ঝোরার জলটা ঝরছে ওখানটা থেকে বেশ দেখা যাবে। উঁচু একটা পাথরের চত্বরের মত। চারপাশের ঘন ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য থেকে পাথরটার খানিকটা বেরিয়ে আছে। পাহাড় এপাশ ওপাশ দুপাশেই এখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু সে জায়গাটায় ওঠা সহজ নয়। অনেক ছোট বড় পাথরের চাঁই-এর ফাঁকে ফাঁকে কাঁটা জঙ্গল জন্মেছে। অবশ্য বনের মানুষ শাইক সর্দারের কাছে তা আদৌ দুঃসাধ্য নয়। সে পাথরটার উপর উঠে দাঁড়াল। ওপারটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঝোরাটা একটু আগে পড়েছে। ওঃ, ঝোপটা খুব জোরে দুলছে এবং বুনো শুয়োরটার গোঙানী শোনা যাচ্ছে। বাঘটা টান হয়ে দাঁড়িয়ে লেজ আছড়াচ্ছে। বা বা বা, লড়াইটা জমবে ভাল। প্রত্যাশা মত শুয়োরটা একেবারে তীরের মত বের হল, সামনে ছুটল; বাঘটাও একটা হাঁকাড় মেরে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করল: লাগল দুই অসুরে মারামারি। শূকরাসুর আর বাঘাসুর। ঝোরার জল ঝরার শব্দ ছাপিয়ে তাদের হুঙ্কার উঠতে লাগল। চারিপাশের গাছ থেকে ভোরবেলার সদ্যজাগা পাখিগুলো পাখা মেলে উড়ল। দলুর মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল দুটো ময়ূর। দলু ভুলে গেল রুক্মিণীর কথা, নাতির কথা, তার আস্তানা এবং নিজের কথা। দুই চোখ বিস্ফারিত করে দেখতে লাগল। সে নিজে বুনো শুয়োরটার দিকে। বাঘটা তার শত্রু। বাহবা বাহবা বাহবা। মুখে বাহবা দিয়ে হাতে তালি দিয়ে সে শূকরাসুরকে উৎসাহিত করতে লাগল। শুয়োরটার অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে কখনও নিজেই সামনে মুঁকছিল, কখনও বেঁকে যাচ্ছিল। বাঘটার সুবিধা হলেই সে তার দুই হাত হাঁটুর উপর রেখে স্থির হয়ে দেখছিল। হে মাতাজী, হে দেবী কন্যা নদী, করুণা করো মায়ী—জিতিয়ে দাও ওই বরাহবারকে।

সত্যই ওই নদী মাতাজী শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা। তা নইলে বাঘের হার হয়! বরাহকে মাতাজীই জিতিয়ে দিলেন। বাঘটাকে এমন গুঁতো মারলে বরাহবীর যে বাঘটা ঘায়েল হয়ে পড়ল এবং পরক্ষণেই জান বাঁচাবার জন্তে জলে দিলে লাফ। বে-হিসেবী লাফ হয়ে গেল। হিসেবের ভুলে পড়ল একেবারে নদীর ভিতর। একেবারে আছাড় খেয়ে পাথরের উপর। সেই পঁচিশ হাত তলা থেকে ছিটকে উঠল জল।

সাবাস! সাবাস! সাবাস! বুনো শুয়োরটাও জখম হয়েছে কিন্তু খুব বেশী নয়। তার সামনের শত্রু অদৃশ্য হতেই সে গোঁ গোঁ করে চলে গেল সামনের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। দলু দেখলে বাঘটা নিচে জলের ঘুরনচাকে ঘুরছে—ডুবছে। পাক কতক ঘুরেই সেটা জলের তোড়ে ভেসে গিয়ে সজোরে ধাক্কা খেলে একটা উঁচু পাথরের সঙ্গে। একটু আটকে থেকে পাথরটাকে বেড় দিয়ে ছুটে চলা জলের স্রোতে চলল নিচের দিকে। দলুও ছুটল; এবার নিচের দিকে ভেসে যাওয়া বাঘটার সঙ্গে। কিছু দূর গিয়ে নদী যেখানটায় কম গভীর হয়েছে সেখানে সে নেমে পড়ল নদীর পাড় ভেঙে। জলের স্রোতের তোড়টা পা দিয়ে পরখ করে নিয়ে জলে নামল। জল এক কোমর। ওই বাঘটা আসছে ভেসে। সে একটা চওড়া উঁচু পাথরের উপর বসল। বাঘটা ভেসে আসছে। এখনও চেষ্টা করছে যা কিছু পাচ্ছে তাই ধরবার। দলু ভোজালী হাতে সেই পাথরের উপর বসে অপেক্ষা করে রইল। বাঘটা পাথরটার সামনে এসেই থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধরল পাথরটাকে। এবং আঘাতের যন্ত্রণায় জলের শ্বাসরোধী কষ্টের বিরক্তির উপর সামনে দলুকে দেখে দাঁত বের করে ভীষণ হয়ে উঠল। দলু সেই মুখের উপর তার ভোজালী দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করলে। ইয়ে লে—ইয়ে লে—ইয়ে লে! ইয়ে—। আ! বাঘটার থাবা ছেড়ে গেছে। পাথর থেকে সেটা জলে ডুবছে। দলু অপেক্ষা করে বসেছিল। লেজটা পেতেই সে হাতে চেপে ধরলে। তারপর এপাশ থেকে জলে নেমে টানতে টানতে নিয়ে এল কিনারায় ধারে। বাঘের মুখখানাকে সে কোপে কোপে একেবারে চুর করে দিয়েছে। নিচের দাঁতের পাটিটাই ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে। সে শক্তিশালী লোক। সেটাকে টেনে কিনারায় হেঁচড়ে তুলে আরও কটা কোপ মেরে উঠে দাঁড়াল। তারপর নদীকে প্রণাম করে বললে, জয় মাতাজী! এই বাঘের রক্ত নিয়ে গিয়ে অর্জুন সিং-এর কপালে তিলক লাগাবে। আর চামড়া ছাড়িয়ে ওর পাঁজরার সেই ছোট্ট হাড়টা, যেটা মানুষকে সৌভাগ্য দেয়, সেইটে পুরে একটা তক্তি বানিয়ে এখন গলায় ঝুলিয়ে দেবে। বড় হলে সেটা পরবে হাতে।

বাঘটাকে টেনে আনতে আনতে তার মনে হল এটা তাকে নদীমাতা ইশারা দিলেন। বললেন, দলু বেটা, আমার কিনারায় থাক্, আমি তোকে এমনি করেই রক্ষা করব। আমার খুশি হলে আমি সব পারি শিবের বরে। শিব আমার ছেলে। আমি বুনো শুয়োর দিয়ে বাঘ মারি। বাঘ হল দুশমন। মীর হবিবও ওই—সুচেত সিংও ওই। থেকে যা এখানে।

হাঁ, ঠিক কথা। মাতাজীর কথা ঠিক। এবার একবার থমকে দাঁড়িয়ে সে ভাল করে চারিদিক চোখ মেলে দেখলে। সামনেই সেই পাহাড়। যা কাল সন্ধ্যে থেকে দেখে আসছে। এখন স্পষ্ট হয়েছে। সকালের রোদ পড়েছে পাহাড়ের উঁচু চূড়াগুলোর উপর। ওঃ, চূড়া তো

একটা নয়। এক দুই করে গুনে গেল দলু। বারোটা। পাহাড় খুব উঁচু নয়। ছোট। একটাই বেশ উঁচু। গায়ে ঘন জঙ্গল। যেন বারোটা পাহাড়ের চুড়ো বারোজন ভারী জোয়ানের মত গোল হয়ে পরস্পরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা ফাঁক থেকে বেরিয়ে এসেছেন এই মাতাজী। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা হলে তো এই বারো জোয়ান পাহাড়ের হাত ধরাধরি করা গোলাইয়ের ভিতরটা দেখতে হয়। ওর ভিতর তো ওই নদীর কিনারায় বড় ভালো জায়গা মিলবে বসতের। হাঁ, দুশমন হলে বারো পাহাড় রুখবে। আর তারা যদি বারো পাহাড়ের গায়ে দুই বারো চব্বিশ ঘাঁটি গাড়ে, তাহলে পাহাড়ের হাত ধরার মত নিচু জায়গাগুলো খুব সহজে রুখতে পারবে। স্রেফ পাথর গড়িয়ে দিলেই কাম ফতে। এক পাথর পাঁচ-দশ সিপাহীকে পিষে মেরে দেবে। বর্শা কিছু করতে পারবে না, তীর না, তলোয়ার না, এমন কি কোন শয়তান দুশমন কামান দেগেও তার কিছু করতে পারবে না।

ওই ভিতরটা তো গিয়ে দেখতে হয়। নিশ্চয় বসতের খুব ভাল জায়গা মিলবে। মিলতেই হবে। নইলে এমন হয়! এখানে থামাবার জন্যে নদীমাতার লীলাতে এইখানেই রুক্মিণীর প্রসব-বেদনা উঠল। অর্জুন গাছতলায় অর্জুন সিং ভূমিষ্ঠ হলো সকালে নদীমাতা তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন বুনো বরা তার দুশমন বাঘকে মেরে দিল। আর ইশারা কাকে বলে?

[খ]

বেলা একপ্রহর হয়ে গেলে দলু সর্দার পঞ্চাশ জোয়ানকে রুক্মিণী, অর্জুন সিং, বালবাচ্চা গরু-বাছুর পাহারায় রেখে, পঞ্চাশ জোয়ান সঙ্গে নিয়ে বের হল এই নদীমাতার কিনারা ধরে পাহাড়-ঘেরা জায়গাটা দেখবার জন্যে।

দু ভাগ হয়ে তারা দুই কিনারা ধরে এগোতে লাগল। দলু হুকুম দিলে, বাঘ দেখলে মারবে —সে দুশমন। হরিণ মারবে—সে খাদ্য। ময়ূর—সে চ'চারটে মারবে, মদের সঙ্গে চাট হবে। সাপ মারবে—সে সব দুশমনের উপর দুশমন। ঢোঁড়া-সাপ মারবে না, সে সাপ খায়। দু-একটা মারতে পার। মারবে না শুধু বুনো শুয়োর। না-ও মারা চলবে না। দুই দল নদীর কিনারা ধরে সেই ঝোরাটা পার হয়ে উপরে উঠে বাহবা বাহবা করে সাবাস দিয়ে উঠে থমকে দাঁড়াল।

দলু যা ভেবেছিল তাই। বারো পাহাড় গোল হয়ে সত্যিই বারো জোয়ানের মত হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরটাও প্রায় একটা গোলাই। বারো পাহাড়ের গা বেয়ে পনের-ষোলটা ঝরনা নেমে এসে একটা বিলের মত হয়েছে। সেই বিলের জল এই ঝোরাটার মুখে হরদম ঝর ঝর করে ঝরে নদীমাতাকে তৈরি করেছে। বিলের চারিপাশটায় ঘন জঙ্গল। বড় বড় গাছ। শাল অর্জুন বট অশ্বত্থ। শাল অর্জুন বেশি। তেমনি নিচে ঝোপঝাড়

আর জঙ্গল। বড় বড় লম্বা গাছে ছড়িয়ে উঠেছে। লতাগুলোর গোড়া পাহাড়ে চিতির মত মোটা। সরু কাঁটা ভরা ছোট লতার অন্ত নেই। হুঁশিয়ারির সঙ্গে পা ফেলতে হবে। নইলে কাঁটা কাঁটা আর কাঁটা। শুধু তাই নয় নিচের গোলাইটার সমস্তই স্যাঁতসেঁতে। পাহাড়ের কোণগুলি থেকে অবিরাম জল চুঁইয়ে পড়ে মাটিকে প্রায় কাদার মত করে রেখেছে। বন-বাসের চাববাসের আয়োজন। একটা সোঁতা জবজবে গন্ধ বাতাস ভারী হয়ে রয়েছে। তবে একটা খবর ওই ভিজে মাটিতে লেখা ছিল সেটা দলু সর্দার আর তার বনচারী সঙ্গীদের চোখে পড়ল। নির্ভুল খবর এবং তারা তা নির্ভুল ভাবেই পড়ে নিলে। নরম মাটির উপর পায়ের ছাপে ছাপে লেখা আছে এই পাহাড়ের বনের ভিতরকার বাসিন্দাদের সংবাদ। হরিণ আর বুনো শুয়োর বেশি। ভালুক কম নয়। বাঘের পায়ের ছাপও মিলল, তবে ছোট; চিতার পায়ের দাগ মোটা কয়েক। বড় পায়ের ছাপও রয়েছে। বাঁদরের হাতপায়ের ছাপও দেখা গেল। আর পাখির পায়ের আলপনা। সজারু খরগোশ শেয়াল এসব তো আছেই। সাপের পেটের আঁকাবাঁকা দাগও রয়েছে তার মধ্যে। পাখিরা আকাশে উড়ছেও। বাঁদরেরা গাছের ডালে রয়েছে। দুটো ময়ূর তাদের সামনেই ঝপ করে নেমে জলের ধারে বসল। দলু বললে, মারিস না। দুই দল দুপাশে দাঁড়িয়েছিল। বললে, এক কাজ কর্ ইবার, তোরা সব উদিক দিয়ে পাহাড়ে উঠ্। আমরা ইদিকে উঠি। দুদিক থেকে সামনে এক মুখে চলি, তাহলে ঠিক মাঝবরাবর দেখা হবেক।

তাই উঠল। দলু নিজের দল নিয়ে উঠল, সব থেকে উঁচু পাহাড়ের মাথাটা তার দেখার এলাকার মধ্যেই পড়বে। দলু আরও বলে দিলে, প্রথমেই প্রথম পাহাড়ের একেবারে মাথায় উঠে খুব উঁচা দেখে গাছের মাথায় চড়বি কাউকে। দেখে লিবি আশপাশ। নিজের দিকের পাহাড়ে মাঝখান পর্যন্ত এসে সে খুশি হল। মাটি পাথরে জমে বেশ শক্ত জমাট জমিন। গাছগুলো এখানে নিচের গাছের মত বড় নয়, জমির উপর পাহাড়ের লতাজঙ্গল আছে কিন্তু তা খুব ঘন নয়। বন পাহাড়ের আজীবন অভিজ্ঞতায় সে বুঝতে পারলে এখানকার জমি কোটেকুটে সমান করে নিলে বাস করা চলবে। খানিকটা মাটি হাতে নিয়ে দেখে একটু মুখে দিয়ে চাখলে, হাতে গুঁড়ো করে দেখলে, শুঁকেও গন্ধ নিয়ে দেখলে।

দলু উৎসাহিত হয়ে বললে, ঠিক আছে। মাটি ভাল। চল।

একজন বললে, চুপ। হরিণ! দুই!

বনের গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে একটা বড় সম্বর, ঘাড় উঁচু করে মুখ তুলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত বাতাসে মানুষের গায়ের গন্ধ পেয়েছে। কান খাড়া করেছে। বড় শিঙওয়ালা নরদ হরিণ। দলু ইশারায় বললে, দুই দল হয়ে দুদিক থেকে। হরিণ চতুর, অত্যন্ত সতর্ক। কিন্তু মানুষ তার চেয়েও চতুর। একদল এড়াতে গিয়ে সম্বরটা ছুটে একেবারে দলুর দলের সামনে এসে পড়ল। দলুদের বর্শা তৈরি হয়েই ছিল। একসঙ্গে তিনটে বর্শা তার ঘাড়ে বুকে গিয়ে আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল। একটা গাছের ডাল কেটে বনের লতা দিয়ে সম্বরটা চার পা বেঁধে ওই ডালে ঝুলিয়ে কাঁধে তুলে তারা চলল। আরও যারা পড়ল একটা

ভালুক। বড় বাঘ দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল বনের মধ্যে। বড় সাপ দেখে দলু থমকাল। 'শঙ্খচূড় লাগে! হিতে?'

হিতলাল পাইক সাপের বিদ্যা জানে। সাপ ধরে। সে গুণী ওস্তাদ। সাপটা একটা পাথর থেকে আর একটা পাথরে উঠছিল। হিতলাল দেখে বললে, শঙ্খচূড় ঠিক লয়, ওই জাতের বটেক। বেদো জাতের বটেক। ইয়ার মাটো বটেক শঙ্খচূড়, বাবাটো বটেক ঢ্যামন। উ জাতের মেয়াগুলান বড়া ছেনাল। তবে ইও কম লয়। উয়ার লেগ্যা ভেবো নাই গ। বনে আমি ঈশের-মূল দেখে এসেছি। এনে লাগায়ে দিলে তার গন্ধে শালারা সে মুখে হাঁটবেক নাই।

বড় পাহাড়টার উপর উঠে তারা থমকাল। পাহাড়ের বুকে পায়ে হাঁটা পথের চিহ্ন। মানুষের পায়ের পথ। মানুষ আছে এখানে! অতি সন্তর্পণে তারা এগিয়ে চলেছিল। মানুষের সব থেকে সেরা দুশমন মানুষ। তারা আছে এখানে। কিন্তু কারা? বনে পাহাড়ে বুনো মানুষ অনেক জাতের আছে। একেবারে উলঙ্গ মানুষও আছে। বনের পশুর মতই ফল-মূল-পাতা জন্তু মেরে মাংস পুড়িয়ে খায়। অখাদ্য কিছু নেই, সাপ মেরেও মুণ্ডটা এবং কঙ্কালটা বাদ দিয়ে বাকিটা ঝলসে নিয়ে পরমানন্দে খায়। তার থেকে ভাল মাংস নাকি তাদের নেই। ঘাসের বীজ সেদ্ধ করে ভাতের অভাব মেটায়। তাদের সড়কি আছে তীর আছে, সবই বিষ মাখানো। এবং লক্ষ্য তাদের অব্যর্থ। ওঁরাও মুণ্ডা সাঁওতালদের মত। অথবা আরও বুনো।

দেখাও মিলল কিছুক্ষণের মধ্যে। দলুরা সন্তর্পণে এগোচ্ছিল—হঠাৎ একটা গাছের আড়াল থেকে একটা কালো উলঙ্গপ্রায় মূর্তি যেন গাছের গুঁড়ির ভিতর থেকেই বেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে তাদের ভাষায় চিৎকার করতে করতে ছুটল। এদেশেরই ভাষা তবে অনেক ওদের নিজেদের শব্দ মেশানো আছে। তারা আশ্চর্য হয়ে গেল লোকটা যা বলছে শুনে। কুটুম এসেছে কুটুম এসেছে বলে চিৎকার করছিল সে। কুটুম অর্থাৎ কুটুম্ব আত্মীয়। সে কি? দুশমন নয়?

দলু বললে, বজ্জাতি। বজ্জাতি বোধ হয়। সব তৈয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে যা।

গোল করে ব্যূহ রচনা করলে দলু। উল্টো দিকে মুখ করে দলুকে ভিতরে রেখে তারা গাছের আড়ালে আড়ালে দাঁড়িয়ে গেল। একজন গাছে উঠল দেখতে। কোন্ দিক থেকে আসছে সে দেখে নিচের লোককে হুঁশিয়ার করবে।

সে হঠাৎ বললে, আসছে। হুই উপর দিক থেকে।

—কত জন রে?

—সদ্দার!

—কি?

—ই তাজ্জব! সবগুলান মেয়ে লাগছেক।

—মেয়ে?

—হুঁ গ।

—ভাল করে দেখ্।

—দেখছি। উয়ারা আধা নেংটা গো। বুক দেখা যেছে। চুল দেখা যেছে। হাতে

পাতায় করে কি সব আনছে। পিছাতে মরদরা। পিছাকার উরা মরদ বটেক। হাতে ধনুক রইছে, কাঁড় রইছে।

—কত গুলান ?

—তা, অ্যানেক বটেক। মেয়াতে মরদে একশো হবে।

দলু তাকে বললে, উদিকে, উদিকের পাহাড়ে আমাদের নোকদের দেখতে পেছিস ?

—উঁহু। হাঁকাব ?

—থাক্। আসতে আসতে সব শেষ হয়ে যাবেক যা হবার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একদল অর্ধ-উলঙ্গ মেয়ে একটু দূরে এসে থামল। তাদের হাতে পাতায় ঠোঙায় ঠোঙায় কিছু রয়েছে। জন দুয়ের মাথায় হাঁড়ি। বুনোজাতের যেনো মদের তীব্র গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে। তারা এসে থমকে দাঁড়াল। তাদের পিছনে একদল প্রায় উলঙ্গ পুরুষ, তাদের হাতে মোটা বাঁশের ধনুক, পিঠে ফলাওয়ালা তীরের চোঙা এবং সড়কি।

মেয়েগুলো হেসে বললে তাদের ভাষায়, কুটুম এস, কুটুম বস। বস কুটুম, মদ খাও। মদের সাথে পিঠা খাও। মাংস খাও। আবার কুটুম, মদ খাও। না খাও তো ফিরা যাও। এ হুকুম মায়ের বটেক, এ হুকুম সাধুবাবার বটেক। খাও যদি তো কুটুম, লইলে দুশমন। ওই দেখ মরদগুলান কাঁড় সড়কি লিয়ে তৈরি বটেক।

অবাক হয়ে গেল দলু। সে জিজ্ঞাসা করলে, তোরা কে ?

—ছত্রিশ জেতে আমরা। খাও কুটুম, খাও। বস কুটুম, বস। না খাও তো মা ঠাকুর কোপ করবে। সাধুবাবা বলে গেছেক ইখানকার জর ধরবে। ই জর মরণজর। ধরলে পরে বাঁচবে না।

তারা পাতাগুলি নামালে কিছু দূরে তাদের সামনে। মদের হাঁড়িও নামালে। তারপর আবার ডাকলে, এস, খাও।

[গ]

বিচিত্র জাত। তিন পুরুষ অরণ্যভূমবাসী, দলুদের কাছেও তারা অতি-বন্য এবং অতি-বর্বর। কিন্তু দলু তাদের সঙ্গে ঝগড়াটা করলে না। তাদের দেওয়া খাবার এবং মদ খেলে। তবে প্রথমেই বলেছিল, ওদের ভাষাতেই বলেছিল, খাবারে বিষ নাই কে বললে ? দিস নাই তো ?

—ওরে বাবা! ওরে মা! হেই ঠাকুর! হেই সাধুবাবা! না না না!

দলু বলেছিল, বেশ, তবে তোরাও আমাদের সঙ্গে খা।

খাবার—অন্য কিছু নয়, ঘাসের বীজের মোটা পিঠে আর মাংস।

তারা বলেছিল, তুমি খাঁটি কুটুম, খাঁটি কুটুম। তুমি খাও আমি খাই। ভেঙে ভেঙে খাই।

দলু জিজ্ঞাসা করেছিল, মাংস কিসের ? সাপ নয় তো ?

—সাপ লয়, বুনো শুয়োর বটেক। খুব ভাল বটেক।

—আমাদের জাত যাবে যে!

—জাত ইখানে নাই। ইটা ছত্রিশ জাতের মায়ের হুকুম। আর সাধুবাবার হুকুম। আমরাই ছত্রিশ জেতে।

দলু বলছিল, আগে মদ দে। তোরা খা আগে।

তারা হেসেছিল খিল খিল করে। মরদরা হেসেছিল হো হো শব্দে —পেসাদ—আমাদের পেসাদ খাবেক ?

মদ খেয়ে দলু তাদের বিবরণ শুনেছিল।

এই যে নিচে নদীর দু ধার, স্যাঁতসেঁতে জবজবে, এই যে ঘন জঙ্গল, এখানে এক মরণজ্বর আছে। সে জ্বর ধরলে মানুষের আর রক্ষা নেই। আর আছে ওই সাপ। ওই সাপে কামড়ালে হাতী মরে। এখানে আগে আগে মানুষ এসেছে। তারা সব ওই জ্বরে আর সাপের কামড়ে মরেছে। এখানে মানুষ আসে না। একদিন এক সন্ন্যাসী এল। এসে এই পাহাড়ে গাছ-তলায় বসল। সে মা মা করে কাঁদছিল। মা তাকে স্বপন দিয়েছে কি ওই মরণজ্বরের পাহাড়ে যা, সেখানে আমার দেখা মিলবে।

কদিন পর জ্বর হল সাধুর। খুব জ্বর। সাধু জ্ঞান হারাল। তখন একটি মেয়ে এসে মাথার কাছে বসে বললে, এই শিকড়টি খা। জ্বর তোর ভাল হবে।

সাধু বললে, তুমি কে মা ?

মেয়ে বললে, আমি ছত্রিশ জাতের মা। আমি মদ খাই, শুয়োরের মাংস খাই। এই রাজ্য তোকে দিলাম আমি। আমার পূজা কর্। ওই মদ, ঘাসের বীজের পিঠা আর শুয়োরের মাংসে ভোগ দে। আর এই দিলাম জ্বরের ওষুধ। এই শিকড় পুঁতে দে, গাছ হবে। জ্বর হলে এই শিকড় দিবি, ভাল হবে। এখানে ছত্রিশ জাত এনে বাস করা। যত ঘর-ছাড়া, ঘর-হারা মানুষ নিয়ে ছত্রিশ জাত। উঁচু নাই নিচু নাই—সব এক।

সেই সাধুর শিষ্য হয়ে বাস করেছিল এরা। যারা এসেছিল কেউ ছিল খুনে, কেউ ছিল ডাকাত, কেউ পলাতক, কতক হা-ঘরে বেদে। নিরাপদ আশ্রয় এটি। জ্বরের ভয়ে কেউ আসে না। আসতে চায় না। তা ছাড়া চারিদিকে পাহাড়। আবার শুধু জ্বরও নয়, এখানে এসে ছত্রিশ জেতেও হয়ে যায়। জাত থাকে না। জাত মানলে ওরা লড়াই করে, তাড়ায়, মেরে ফেলে। যদি কোন আগন্তুকেরা জেতেও তাহলেও থাকতে পারে না। কারণ তাদের ওই জ্বর ধরে। যে জাত মানে তাকে ওষুধ দিতে মানা। ওষুধ কি তা কেবল একজন চেনে, আর কেউ চেনে না। তার মরবার সময় হলে সে আর একজনকে চিনিয়ে দিয়ে যায়। মায়ের আদেশ আছে সে যদি মায়ের আদেশ ভঙ্গ করে অন্য কাউকে ওষুধ বলে দেয় তবে তার হাতে ওষুধ খাটবে না। আর যে বলে দেবে—তার ছেলেপুলে সব মরবে। মায়ের দেওয়া আরও একটি ওষুধ আছে, সেটা ওই সাপের ওষুধ। সে ওষুধ কেবলমাত্র চার-পাঁচঘরের লোকের মধ্যে জানে। তারা এখানে যখন আসে তখন বেদে ছিল—এখন সবার সঙ্গেই একজাত—

ছত্রিশ জাতিয়া।

দলু এবং দলুর দল মদের নেশায় লাল চোখ বিস্ফারিত করে গল্প শুনছিল। মদটা খুব কড়া। নেশা যেন সাপের বিষের মত শন-শন করে রক্তের মধ্যে ফিরছে। মাথায় উঠে ঝিম্-ঝিম্ ঝিম্ঝিম্ করিয়ে দিচ্ছে মগজকে। কিন্তু দলু পাকা মদ খাইয়ে এবং তার সর্দারী করা বুদ্ধি এরই মধ্যে বেশ ফন্দিগাতির সঙ্গে খেলছিল। সে ইশারায় সকলকে বারণ করেছিল মদ খেতে। তাতেও সকলে বোঝে নি। তখন সে বলেছিল, হাঁ হাঁ বাবা পাইকরা, গুরুর আদেশ ভুলবি না। যে ঠাঁই যাবি সে ঠাঁইয়ের নিয়ম মানবি। মানলি তো বাঁচলি, সুখ পেলি। না মানলি তো মরলি, দুখ পেলি। কি বল্ কুটুমরা?

খুব খুশি হয়ে তারা বলেছিল, হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। তুমি কুটুম ভারী কুটুম, তুমি কুটুম হিয়ার কুটুম।

একটা পূর্ণযৌবনা মেয়ে, সে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরেছিল।

ওদের মাতব্বর বলেছিল, উ তুর কাছে গেল। তু উকে পেলি। তুকে দিলম। তুকে আমরা নিলম।

মেয়েটা দলুর হাত ধরে টেনে বলেছিল, চল্ আমার ঘরকে।

—বস্। তাহলে আমার গুরুর আর একটি কথা বলি। তুদের গুরুর কথা মানলাম। আমাদের গুরুর কথা শোন্। গুরু বলেছে, নিয়ম মানবি। সুখে থাকবি। কখনও গলা ঠেঁসে খাবি না পরের পেয়ে, খেলে পরে মরবি। আর তিন পাত্তরের বেশি মদ খাবি না কুটুম বাড়িতে পেথম দিন। কি? খারাপ কথা?

—না না, ভাল কথা।

দলুরা সেখানে সারাটা দিন রইল। ইতিমধ্যে ওদিকের দলটা ওদিকটা সমস্তটা ঘুরে প্রায় অপরাহ্ণ বেলায় এখানে এসে পৌঁছেছিল। সারাদিন ঘুরে তারা ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। শিকার তারাও করেছে কয়েকটা ময়ূর, সজারু, কতকগুলো পাখি, দুটো হরিণ। একটা হরিণ তারা ছাড়িয়ে আগুন করে ঝলসে খেয়েছে তবে ওদের দুজন জখম হয়েছে। একজন মরেছে। একটা পাহাড়ে নাকি ভিমরুলের গুহা আছে। আগে যারা যাচ্ছিল তারাই ওই গুহার মুখে এসে হঠাৎ ভিমরুলের সামনে পড়ে। দেখতে দেখতে ভন ভন শব্দ করে ঝাঁক বেঁধে তাদের তাড়া করে। তাদের কজন তাড়াতাড়ি করে ছুটতে গিয়ে শেষ পথ না পেয়ে পাহাড়ের পাথরের উপর থেকে ঝাঁপ খেয়ে পড়ে। তারা হাত পা ভেঙে বেঁচেছে। একজনকে ভিমরুলেরা ছেঁকে ধরে বিঁধে মেরে ফেলেছে। পিছনের দল থমকে গিয়ে পিছিয়ে যায়। তারপর শুকনো ডাল যোগাড় করে আগুন জ্বেলে সেই জ্বলন্ত ডাল মাথার উপর ঘুরিয়ে অনেক ঘুরে পাহাড়টা পার হয়েছে।

বুনোদের মাতব্বর বললে, বাঘ, উগুলান মায়ের বাহন বটেক। আগে আরও ছিল, ই পাহাড়ে ছিল। তা সি সন্ন্যাসী মাকে বলে বনে আগুন লাগায়ে মন্তর পড়ে যজ্ঞ করলেক। তখুন ই পাহাড় থেকে ভিমরুলরা পালাল। মায়ের আদেশ রইল—উ পাহাড় ভিমরুলের রইল। ওরা তুদের বিপদে আপদে সহায় হবেক। বিন্ধ্যাচলে মায়ের সৈন্য আছে—ভ্রমর।

এখানে ভিমরুল।

দলু সারা দু প্রহরটি সেই যুবতীর সঙ্গে কাটিয়েছিল তার ঘরে। মেয়েটা বলেছিল, তুমি একটা বীর বটেক। বাবা রে, গায়ে কত বল তুমার! তেমনি কেমন রঙ বটেক গোরাপারা! চোখ দুটো বড় বড় বটেক! তুমি খুব সোন্দর।

দলুর বয়স তখন দু-কুড়ি সবে পার হয়েছে। সে তখন তরা জোয়ান।

তার নিজের রূপের এবং শক্তির অহংকার ছিল। তার ভাল লেগেছিল যুবতীর মুখর প্রশংসা। তার শখের গোঁফে তা দিয়ে বলেছিল, ই দুটো?

—হুঁ। খুব খুব খুব ভাল। আমাদের মরদগুলার মোচ ইতিটুকুন টুকুন—ছাই।

দলু স্ফীত হয়েছিল। কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশ হয় নি। সে জেনে নিয়েছিল এখানকার সবকিছু এবং জানতে পেরেছিল যে এই এদের আত্মরক্ষার কৌশল। এখানে তাদের মত দু-চার দল কখনও কখনও এসেছে। এখানে থেকেছে। মদ আর নারীর সঙ্গ তাদের পা এখানকার মাটিতে পুঁতে দেয়। কিন্তু দশ বারো দিনেই তাদের জ্বর শুরু হয়। জ্বর প্রবল, তার সঙ্গে রক্ত দাস্ত। তিন দিন চার দিনের বেশি কেউ বাঁচে না। এদের সর্দারই ওদের ওঝা। সেই জানে শুধু ওই জ্বরের ওষুধ। সতিই জানে। তাদের নিজেদের মধ্যে জ্বর হলেই শুধু সেই শিকড় দেয়। কিন্তু যারা আসে তাদের জন্য শিকড় নিয়ে থাকে। তারা মরে।

এখানকার জ্বর নিয়ে যারা ফিরে যায় তারা সেই জ্বর নিজের গ্রামে ছড়ায়। সেই জন্য ছত্রিশ জাতের জঙ্গলে কেউ আসে না। এখানে চোকবার পথকে লোকে বলে যমদুয়ার। ওই যে নদীটা—যে মুখটায় বেরিয়ে ঝোরা হয়ে ঝরে ঝরে পড়ে বয়ে যাচ্ছে, ওইটারই নাম যম-দুয়ার। কখনও কখনও দু একটা মানুষ মিশে থেকে গিয়েছে। তাদের মেয়ে এদের দিয়েছে। ওদের মেয়ে ওরা কুটুম করলেই বিয়ে খুশি করে।

মদের ঝোঁক কেটে আসছিল দলুর। দলু লাইকদের সর্দার, তার বুদ্ধি অনেক। সে নিজেদের মধ্যে দলে দলে প্যাঁচ কষেছে। এক রাজার হয়ে অন্য রাজার হয়ে লড়াই করতেও বুদ্ধি নিয়ে খেলতে হয়েছে।

রাজারা সোজা নয়, তারা খুব বাঁকা মানুষ। লড়াই খেতার পর কত বার, যে-রাজার হয়ে তারা লড়েছে, তাদের সঙ্গেই সময়ে আচমকা লড়াই দিয়ে লুটেপুটে পালাতে হয়েছে। নইলে সময় পেলে ওই রাজাই তাদের মেরে ফেলত। বুদ্ধি তার আছে।

সে অনেক ভেবে সেদিনের মত তার কাছে বিদায় নিয়েছিল। বলেছিল, কাল আসব। আজ যাই কুটুম। আজ আচমকা এসেছি। কাল জিনিসপত্র নিয়ে আসব।

তারা দিয়েছিল এক হাঁড়ি মধু।

দলু চেয়েছিল নুন, নুন দিতে পার?

তারা তাও দিয়েছিল। বলেছিল, নুন আছে—যত লিবে। উই নিচে জবজবে একটা ঠাঁইয়ে ফুটে ফুটে উঠে সাদা হয়ে।

আস্তানায় ফিরে এসে সারা রাত্রি অনেক চিন্তা করে পরামর্শ করেছিল ভৈরবের সঙ্গে। ভৈরবকে বলেছিল, ভৈরব, এই ঠাঁইটার মতন ভাল বসতের জায়গা মিলছে না। ওই বারো

পাহাড়। ইটার সঙ্গে উটা যেখানে যেখানে মিলেছে সেখানে ঘাঁটি বসালে—আর নদী মায়ের দু মুখ, একটা উ-মাথায় ঢুকার মুখ আর ই-মাথায় বেরুবার মুখ আগলে দিলে যমও ঢুকতে লারবে। তার উপরে আছে ওই জ্বরের বিষ। জ্বর ধরলে দশ দিনে হাজার জনা খতম করবেক। ই জাগা ছাড়া হবে নাই। শুধু জানতে হবেক ওই জ্বরের ওষুধের শিকড় গাছ, আর সাপের বিষের শিকড় গাছ। সাপের ওস্তাদ আমাদের আছে। কিন্তুক জ্বরের বিষের ওষুধটা—উটা আদায় করতে হবেক।

ভৈরব বলেছিল, সি কি করে আদ'য় করবেক? ওই একটি লোক জানে। সেই সদ্দার। সে তো দিবে নাই সিংজী।

—দিবে রে দিবে। সে ঠিক বার করে লিব আমি। হেসেছিল দলু।

—মেরে? যাতনা দিয়ে দিয়ে?

—সে শেষে। আগে শুলুকে।

—সিটা কি রকম?

—কটা খুব চালাক চতুর ছুঁড়ি চাই। চতুর হ' চাই, চটকদার হ' চাই। বেটাছেলেকে খেলাতে পারা চাই। যে সব মেয়ে আমরা ইখান উখান থেকে লুটে ছিনিয়ে এনেছি—তাদের ভিতর থেকে বেছে আন।

—হুঁ, বুঝলম। বলেছ ঠিক।

দলু বলেছিল, ইদিকে আমি রইলম: যে মেয়েটো আমাকে ধরেছে সিটা ওই সদ্দারের ছিল। সিটা আমাকে কাল খুব ভুলাতে চাইলে।

গোঁফে তা দিয়ে দলু বললে, তা সিটাই ভুলল আমার কাছে। আমিও দেখব, সি জানে কিনা। আমার সঙ্গে দশটা মরদ যাবেক। আর পাঁচটা ছুঁড়ি। দে দেখি দেখে। ঠিক সাত দিন বাদে আমি খবর দিব। না পেলে তু জানবি বিপদ। তখুনি তু যাবি দল নিয়ে। একবারে শালাদিকে সব শেষ করে দিবি। সাত দিন তু রইলি। আমি রুক্মিণীর বাবা, তু তার কাকা। রুক্মিণী আর অর্জুন ইদের ভার তখন তুর।

—তাই হবেক সদ্দার।

—তু পিতিজ্ঞে কর্। আমি যদি মরি তবে তোর জান থাকতে উদের দুখ হবে নাই। তিন সত্যি কর্।

—করলাম। করলাম। করলাম।

—আমিও বললাম, সদ্দারী তখুন তোর। রুক্মিণী তোর বিটী, অর্জুন তোর নাতি। বেইমানি করলে তোর দুটো বেটা আছে, দু বেটার মাথায় বাজ পড়বে।

—পড়বে। পড়বে। পড়বে। শুধু তাই নয়—বেইমানী করলে আমার কুঠ হবে। হল তো?

—সাবাস, সাবাস! তু আমার মায়ের পেটের ভাইয়ের বাড়া। এখুন দেখে দে পাঁচটা ছুঁড়ি, দশটা মরদ। আর একটা কথা ভৈরব—

—কি বল।

ওই ঝোরার ধারে উঁচা শাল গাছটোর ডগায় একটো সাদা কাপড় বেঁধে দে। কুনো বেপদ হলে, রুক্মিণী অর্জুনের কুনো রোগ হলে উটা নামায়ে লিবি, লাল কাপড় বেঁধে দিবি। হোক্।

—হোক্।

দশটা মরদ—সেরা মরদ আর চালাক মরদ বেছে দিল ভৈরব। আর পাঁচটা লয়, ছটা মেয়ে এনেছিল। সব কটিই যুবতী এবং চঞ্চলা, না, তারও বেশি তারা—চপলা। এরা সব ওদের হরণ করে আনা মেয়ে বা হরণ করা মেয়ের মেয়ে। ওদের মধ্যে এরা দাসীর মত থাকে। ওদের ভোগ্যা।

দলু বলেছিল, সব শুনেছিস গ— ছুঁড়িরা?

তারা মুখ নামিয়ে মুচকে মুচকে হেসেছিল।

দলু বলেছিল, শুন্ শুন্, লাজের কথা লয়। তুদের হতে হবে মেনকা রম্ভা। অপ্সরী হতে হবেক। অসুর ভুলাতে হবেক। হাঁ! আর এই ছোকরা বেটারা! উদের মেয়েদের সঙ্গে মাততে পারবি তো?

তারা খুক খুক শব্দ করে হেসেছিল।

দলু বলেছিল, হুঁ—শুধু মাততলে হবে নাই। মাতাতে হবেক।

মেয়েদের মধ্যে সেরা মেয়ে পক্ষি—তাকে নিয়ে দলু ছত্রিশ জাতিয়ার সর্দারকে দিয়ে বলেছিল—এই লে। ইটোকে তোকে দিলম। তু আমাকে ঝুমরীকে দিলি, ইকে আমি তোকে দিলম।

তিন

বুদ্ধির খেলায় দলুর জিত হয়েছিল। তিন দিন পরই দলু পেট ধরে পড়েছিল, পেটে যাতনা হচ্ছে। চার দিনের দিন পক্ষিকে, যাকে দলু ছত্রিশ জাতিয়ার সর্দারকে দিয়েছিল, সেই পক্ষিও একটা ইশারা দিয়েছিল। তারপর সেই যুবতী ঝুমরীকে বলেছিল, ঝুমরী, আমাকে বাঁচা, আমি কখুনও পালাব নাই।

ওদিকে পক্ষিও পেটের যাতনায় ভান করে পড়ে ছিল এবং সর্দারকে বলেছিল, সর্দার, আমাকে বাঁচাও। সর্দার তাকে শিকড় দিয়েছিল খেতে। পক্ষি তাকে দেওয়া সেই শিকড়টা চতুরালি করে খুঁটে বেঁধেছিল। এদিকে ঝুমরী দলুকে দেওয়া শেকড়টা দেখে, সেটা খেতে দেয় নি, বলেছিল, আমি ঠিক শিকড় আনছি, ইটা খেয়ো না। তারপর আর দেরি হয় নি গাছটা জানতে। দলুর গোটা অসুখটাই নকল। সে ঝুমরীর দেওয়া শিকড়টা খাবার ভান করেছিল; খায় নি। অবসর মত গোপনে পক্ষির সংগ্রহ করা জড়ির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে বুঝেছিল—হ্যাঁ, এই আসল জড়ি।

ইতিমধ্যে পাঁচ দিনের দিন সত্যিই একটা জোয়ানের জ্বর হয়েছিল। সেদিন ছত্রিশজেতে

সর্দার ওষুধ দিলে। সেটা দেখে দলু বলেছিল, সর্দার, ঠিক জড়ি দাও। জাল দিয়ো না।

সর্দার বলেছিল, জাল নয়। ঠিক বটেক।

—না। নয়। এই দেখ আমার কাছে আসল জড়ি আছে।

চমকে উঠেছিল সর্দার, উ তুমি কুথা পেলে?

দলু সোজা উত্তর না দিয়ে বলেছিল, কুটুম বলেছ, কুটুম হয়ে রইলাম। কিছু কইলাম না। এখুন বেইমানী করলে তোমার ই জাগা আমি চষে দিব, ধ্বসে দিব। তোমাদের সব লোককে কেটে ফেলাব। হাঁ।

ছত্রিশ জাতিরা সর্দার এবার বোবা হয়ে গিয়েছিল। এদিকে দলু তার এক জোয়ানকে পাঠিয়েছিল ভৈরবের কাছে: যেন বিশ পঁচিশ বাছাই মরদ তুরন্ত এসে হাজির হয় একেবারে তৈয়ার হয়ে।

তাই এসেছিল। এবং ছত্রিশজাতিরা সভের গুপ্ত অস্ত্র মরণজ্বরের ওষুধের জায়গাটিতে ওদের সর্দারকে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, চেনাও ওষুধ। শোন কথা। ওষুধ যদি চেনাও, তবে তুমি থাকলে, আমি থাকলাম। মিতা বলব। আমার লোকেরা থাকবে, তোমরাও থাকবে। মুখের কুটুম সত্যি কুটুম হবে। তা কইলে তুমাদের বেটাছেলেদিগে মায়ের থানে লিয়ে গিয়ে কাটব। মেয়েগুলাকে লুটে লিব। চলে যাব ইখান থেকে। বাস, দেখ। তবে গাছ আমি চিনেছি। পক্ষি দিয়েছে জড়ি, ঝুমরী সেও এনে দিয়েছে জড়ি, আমি গন্ধ দেখলম এক, চেখে দেখলম এক। ছাপি আমার কাছে নাই।

সর্দার বোকা হয়ে গিয়েছিল এবং সত্যিই সব দেখিয়েছিল। কিন্তু লোকটা খাঁটি লোক ছিল। দলু তার নামে মাথা নামায়। সে যা করত তার ধরম পালন করত। কি করবে? ওইটাই ছিল এদের নিয়ম। কে করেছিল কে জানে! হয়তো সেই সন্ন্যাসী, নয়তো এরাই।

এদের বুদ্ধিমত এই মরণ জ্বরে জর্জর জায়গাটির রাজত্ব বজায় করবার এ ছাড়া অস্ত্রও তাদের ছিল না। গুপ্ত নিয়ম। নিয়ম ছিল—কুটুম্বিতার ভান করে জায়গা দেবে। তারপর জ্বর ধরলে আসল ওষুধ দেবে না; যা-তা জড়ি দেবে। তা হলে তারা জ্বরে সব মরবে—নয় তো প্রাণের ভয়ে পালাবে। এ সর্দার সেই নিয়ম পালন করতে চেয়েছিল। কিন্তু দলুর বুদ্ধির কাছে হার মেনে ওষুধ চেনাতে বাধ্য হয়েছিল। নিয়ম ভেঙে সে আর বাঁচে নি। মরেছিল ইচ্ছে করে। সেদিন সে খুব মদ খেয়ে ফুর্তি করেছিল। কিন্তু পক্ষিকে নিয়ে নয় ঝুমরীকে নিয়ে। তবে পক্ষি দলু সবাই ছিল। সে মদ খেয়ে দলুকে বলেছিল, আজ কিন্তু আমরা নাচব—সারারাত নাচব।

দলু বুঝতে পারে নি। বলেছিল, বেশ তো।

সে আর ঝুমরী নাচ আরম্ভ করেছিল। সে মাদল বাজাচ্ছিল, ঝুমরী নাচছিল। মধ্যরাত্রি তখন। দূরে উঠেছিল বাঘের ডাক। বাঘের ডাক দূরে দূরে রোজই ওঠে। এখানে মরদরা পাহারা দেয়, টিন বাজায়, আগুন জ্বালে। বাঘেরও খাদ্যের অভাব হয় না। জানোয়ার আছে। হরিণ, বুনো বরা। হরিণ উপরের দিকে অনেক। কেবল বড় পাহাড়টায় নেই।

ছত্রিশ জাতিয়ারা তাড়িয়েছে। নইলে ওদের টানে বাঘ আসবে।

বাঘের ডাক শুনে সর্দার মাদল থামিয়েছিল। ঝুমরীও থেমেছিল। সর্দার এসে ঝুমরীর হাত ধরে বলেছিল, চল।

দলু ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি এবং তার তখন ঘুমও এসেছে। তার ঘুম ভাঙিয়েছিল পঞ্চি।

—সদ্দার!

—কি?

—উরা চলে গেল। ঝুমরী আর সদ্দার।

—কোথাকে?

—বনে বনে ছুটে চলে গেল।

দূরে তখন বাঘ ডাকছে। দলু বলেছিল, সে কি?

উঠে দাঁড়িয়েছিল সে। ডেকেছিল, সদ্দার! সদ্দার! ঝুমরী!

ছত্রিশ জাতিয়ার একজন এসে বলেছিল, ডাকিস না উদের। উরা বনে গেল। ডাক এসেছে।

—কার?

—মায়ের। মায়ের বাঘ ডাকছেক শুনছিস না?

—কি বলছিস?

—ঠিক বুলছি। উ তো গেল বাঘের প্যাটে যাবে বলে। বাঘ আজ তাই লেগে তো আইছে। মা পাঠাইছে।

—সে কি!

—হুঁ। তুকে সে ওষুধ দেছেলে। ইখানকার যাদুটি গেল। উর অপরাধ হল, পাপ হল। সাধুবাবার, মাঠাকরুনের আদেশ বটেক্ কি—যে সদ্দার ই ফাঁস করবে তাকে পাপ লাগবে। কুঠ হবে। তবে বাঘে ডাকলে যদি তার প্যাটে যেতে পারে তবে পাপ খণ্ডাবে। উ চলে গেল। যেতে দে। আমরা তুর বশ মানলম।

পরদিন সকালে খুঁজে দেখেছিল দলু, সর্দারের দেহের কিছু পায় নি, পেয়েছিল তার গলার মালা। বুনো ফলের কালো আর লাল বীজের মালাটা। আর কোমরের গাছের ছাল থেকে বের করা সুতোর ছোট্ট কাপড়খানা। ঝুমরী কিন্তু মরে নি। সে মরতে ভয় পেয়েই উঠে পড়েছিল একটা গাছে। দলু সর্দার তাকে নামিয়ে ফিরিয়ে এনেছিল। মেয়েটা কিন্তু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল—আমি লারলম গো, গাছে উঠে বাঁচলম।

দলু তাকে খুব সমাদর করে সান্ত্বনা দিয়েছিল।

* * *

তারপর দলু ছত্রিশ জাতিয়ার জঙ্গলে নিয়ে এসেছিল তার সমস্ত দল। খুব হিসেব করে সে এখানে বাস পত্তন করেছে। খুব হিসেব করে।

শুধু ভৈরবের সঙ্গেই সে পরামর্শ করে নি। ঝুমরীর সঙ্গে আর পঞ্চির সঙ্গেও পরামর্শ করে-

ছিল। ওই দুজনকেই সে নিজের উপপত্নী করেছিল। পক্কি লুঠ করে আনা মেয়ে, সে ভাল জাতের মেয়ে, বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ। সে যখন ওষুধের শিকড়টা দেখেছে তখন তার স্বাদ জানে, গন্ধ জানে। খুঁজে বার করতে তার খুব দেরি হবে না। ঝুমরীর বুদ্ধি না থাক সে ওষুধ চেনে। এ ওষুধের উপর পুরো অধিকার না থাকলে ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গল পাহাড়ের রাজত্ব থাকবে না।

এ ওষুধ অন্যে জানলে সে দল বাঁধবে। দল নিজের শক্তিতে। তার দলকে না পারলে বাইরে থেকে অন্য দল ডেকে আনবে।

দল বাঁধবে এই ভয়েই সে তার একশো পাইককে পাশাপাশি তিনটে পাহাড়ে বাস করিয়েছিল। নইলে ভৈরব বলেছিল, সর্দার, সব পাহাড়ে ছড়িয়ে কিছু কিছু করে বসাও।

দলু বলেছিল, না ভৈরব। মন না মতিভ্রম রে! উ হবে না। বেশি ছড়ায়ে বসালে পরে পাড়ায় পাড়ায় কোঁদলের মতন কোঁদল বাড়বে। কোঁদল থেকে ঝগড়া খুনোখুনি।

ভৈরব সেটা মেনেছিল।

দলু বলেছিল, দেখ্ যা করছি, সব ওই কুমর অর্জুন সিং-এর জন্যে। রাজা মাধব সিং-এর বেটার জন্যে। তার জন্যে এই ছত্রিশ গড়িয়া জঙ্গলকে গড় বানিয়ে তার হাতে দিয়ে যাব। আর বলে যাব, কুমর অর্জুন সিং, তুমি আমার পাতি বট। বিটীর বেটা বট, কিন্তু তুমি খাঁটি ছত্রি, রাজপুত। আমি তোমার দাদো, মায়ের বাপ। আমরা এককালের শোলাঙ্কী রাজপুত। অগ্নিদেবের বংশ। আপদ্ধর্মে আত্মরক্ষার জন্য পৈতে হারিয়ে শুদ্ধ হয়েছি। আমরা আবার শুদ্ধীদের মধ্যে বারোভাইয়া, পৈতে ছেড়েছি কিন্তু ক্ষত্রিয় ধর্ম আমাদের অটুট রেখেছে; আমাদের বেটীরা দুবার শাদী করে না। বেটী আমার কিষণজীর ভজন করে, পূজন করে। আমার বেটী তোমার মা সাক্ষাৎ দেবী মহাসতী। মাধব সিং-এর রাধা হয় নি, সে শাদী করে তার রুক্মিণী নাম আর শোলাঙ্কী রাজপুতের ধরম রেখেছে। তোমার বাপের কাছে কথা দিয়েছিলাম তোমাকে বাঁচাব, তোমাকে রাজা করে বসিয়ে যাব। তা এই ছত্রিশ গড়িয়ার জঙ্গলকে গড় বানিয়ে তোমাকে রাজা করলাম। দিয়ে গেলাম এই পাইকদের। তুমি এদের রাজা, এদের দেবতা। এদের ভালবেসো। আর একটি কাম করো রাজা, আমার ভাইয়া, এদের সঙ্গে চলে তুমি এদের জাতে তুলো। এদের বেটী ভাল লাগলে শাদী করো, রাখনী করো না।

ভৈরব অভিভূত হয়ে শুনছিল। সে বলেছিল, সর্দার, বাহা! বাহা! বললে তুমি। বাহা বাহা বাহা! ধরমের কথা। মানুষের মত কথা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক সর্দার। তামাম পাইক কুমর অর্জুন সিং-এর গোলাম। দাঁত দিয়ে তার পায়ের কাঁটা তুলবে। জান দিয়ে তার হুকুম তামিল করবে। কুমর অর্জুন সিং বড় ভারী রাজা হবে তুমি দেখো, মুলুক তার নামে কাঁপবে। কুমর বড় হতে হতে আমাদের একশো জোয়ানের ছেলেপিলেতে পাঁচশো হয়ে যাবে বিশ বছরে। আমি বলি চন্দনগড়ে যারা বেওয়া হল, মরদ যাদের মরল তাদের সব সাঙা দিয়ে দাও! এক এক জোয়ান দুই তিন পরিবার। তাহলে পাঁচশো কেন হাজার হয়ে যাবে। আর একটা কাজ কর।

—কি ?

—এই বুনো মরদগুলোকে মেরে ফেল। এদের মেয়েগুলোকে দিয়ে দাও পাইকদের।

—না। ঘাড় নেড়ে দলু বলেছিল, না ভৈরব। সে বেধরম হবে, অধরম হবে। দেখ, মাধব সিংকে মারলে অধরম করে, আমাদের পাইকদের মারলে হাজার গুনায় তিনশো জনাকে ঘিরে। সে অধরম, সে পাপ। ভগবানের খাতায় সে পাপ উঠে গেল। সে অধরমে আমরা দুনিয়াতে দুঃখ পেলাম, ভগবানকে দেখালাম—বললাম বিচার করো। মরণের পর তিনি বিচার করবেন। ওরুর করবেন। সুচেত সিং মার হরিব এদের মরণের পর এর বিচার জরুর হবে। চাঁদ সুরয় এখনও উঠছে, দিন হচ্ছে রাত্রি হচ্ছে। বিচার হবে না ? কুমর অর্জুন সিং বড় হবে, মস্ত বীর হবে। ঘোড়ায় চড়ে তলোয়ার হাতে ছুটবে টগাবগ টগাবগ। দুশমন দেখবে কি যম আসছে। সে তীর ছুঁড়বে, দুশমনের বুকে বাজবে বাজের মত। ওই মীর হরিব, ওই সুচেত সিং-এর খুন নিয়ে আসবে। রুক্মিণীর পায়ে ঢালবে, বলবে, লাও মা—দুশমনের খুন। বাপের খুন তারা নিয়েছিল, আমি আনলাম তাদের খুন। দুনিয়া ধন্যি ধন্যি করবে। উপরে দেবতা বলবে, সাধু সাধু। জিতা রহো। তেমনি বেইমানী করে এই মানুষ কটিকে অনেকজনা মিলে মেরে ভগবানের অভিশাপ আমি কুড়োতে পারব না। আমি ছত্রি রে। শোলাঙ্কী রাজপুত। অগ্নিদেবের বংশ। তা ছাড়া এখানে যে মাতাজী আছেন তিনি রুষ্ট হবেন। যে সাধু ওদের বসিয়ে গেছেন তাঁর আত্মা কোপ করবেন। খবরদার—খবরদার।

ভৈরব বার বার ঘাড় নেড়ে বলেছিল, ঠিক। ঠিক। বহুৎ বহুৎ ঠিক।

দলু বলেছিল, ওই ওষুধটার জন্যে সর্দারের সঙ্গে চাতুরি খেলে মনটা খচ্‌খচ্‌ করছে। লোকটা নিজে গেল বাঘের পেটে। তবে—

একটু ভেবে বলেছিল, না, আমার দোষ নাই ভৈরব। ও লোকটাই তো চাতুরি খেললে প্রথম। আমি তো নই। ভেবে দেখ, কুটুম বলে ডাকলে, মদ দিলে, পিঠা দিলে, বুনো বরার মাংস দিলে,—আমরা জাত মানলাম না, কুটুম্বিতে মেনে নিয়ে ভগবানকে ডেকে খেলাম। কিন্তু উর মতলব ছিল আমাদের জর ধরিয়ে মেরে ফেলা। জাল ওষুধ দিলে বলেই আমি জাল ফেললাম পাল্টা। ঠিক কি না ?

—হাজার বার ঠিক।

দলু বলেছিল, বাস্। তবে আর অধরম করব না। উ দিকে মারব না। উরাও থাকুক আমাদের অধীন হয়ে। আমরাও থাকি। এখন এক কাজ কর—জলদি গাছ কেটে ফেলে সব আগে একখানা ঘর বানিয়ে দে কুমর অর্জুন সিং আর রুক্মিণীর জন্যে। তা'পরে সব চলে আয়। এসে ঝপাঝপ ঝুবড়ি বানিয়ে লে যেথম। তা'পর হবে ঘর বাড়ি। কি বল ?

—ঠিক বলেছ।

দলু বলেছিল, তবে যে দিন আসবে সেইদিন ওই মা আর সাধুর স্থানে পূজা দিতে হবে, হাঁ। তারপর হবে বসত একে একে।

—ঠিক আছে, ঘর একখানা বানাতে কদিন ? চার চার মিস্ত্রি আছে, পঞ্চাশ ষাট জোয়ান আছে, বুড়া আছে চল্লিশ, চৌদ্দ পনের ষোল বছরের ছেলে আছে পঞ্চাশ। শক্ত পোক্ত মেয়ে

আছে, ছু তিন শো আছে ছুঁড়িতে আধ বুড়িতে। সবাই খাটবেক। ক দিন লাগবে?

পরদিন সকাল থেকে গাছ কাটা শুরু হয়েছিল। ছত্রিশ জাতিয়া বুনোরা থাকে ছোট ছোট ঝুবড়ীর মধ্যে। তারা আয়োজন দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

দলু ভৈরবকে বলেছিল, ভৈরব, এদের জন্তে কাপড় চাই রে। মেয়েগুলা আধ ল্যাংটা থাকলে চলবে না। ছোঁড়াগুলান জাহান্নামে যাবে। বেটাছেলেগুলাকে কাপড় দে। নইলে আমাদের মেয়েরাই বা বেরাবে কি করে?

—কাপড় কোথা মিলবে?

—কাছে পিঠে হাট কোথা খোঁজ্।

—কিনবার টাকা কোথা?

—বেকুব বেহদ্দা কুথাকার! কিনবি কিরে? কিনবি কি? আঁ? লুঠ! হাঁ। খাজনা আদায়! কুমর অর্জুন সিংয়ের লস্করাশা! আদায় শুরু করে দে।

চার

এ সব হল বিশ বছর আগেকার কথা। আজ বিশ বছর বাদ দলু সর্দার এখন পঁয়ষট্টি বছরের প্রৌঢ়। বালেশ্বর অঞ্চল থেকে সন্ত-ফেরত ভীম পাইকের ছেলে গণ্ডারের কাছে বর্গীদের নতুন সমাবেশের কথা শুনে ভাবছিল। খবর ওই গণ্ডার এনেছে। পথে সে শুনে এসেছে—বর্গীরা আবার আসছে। ভাবতে ভাবতে সে চঞ্চল হয়ে উঠেছে একটা কারণে। কুমর অর্জুন আজ বিশ বছরের মরদ। বহুৎ আচ্ছা জিন্দা জোয়ান। এইবার তাকে একদিন সকলকে ডেকে ওই মায়ের মন্দিরের সামনে পাথরে বাঁধানো সর্দারীর বেদীর উপর আচ্ছা এক কাঠের চৌকি রেখে রাজা করে দেবে কি না। সমস্ত কথা বলে বলবে কি না যে, কুমর অর্জুন, তোমার বাপকে অধরম করে খুন করেছিল মীর হবিব। সে সাক্ষাৎ শয়তান। সে চলল আবার বাংলা মুলুকে তোমার গড়ের পাশ দিয়ে। তুমি পার তো শোধ নাও তোমার বাপের মৃত্যুর। এই মস্ত সুযোগ। ওদিক থেকে আসবে নবাব আলিবর্দী। তার সঙ্গে লড়তে হবে মীর হবিবকে। মীর হবিব বর্গী, এরা সামনাসামনি লড়ে না। এরা নবাব এলে পালায়, নবাব ফিরলে পিছু নেয়। ঠিক নেকড়ের দল। আবার নবাব ফেরে তো ওরাও ফের পালায়। যারা শক্তিমান তাদের সামনে শেয়াল, পিছনে বাঘ। তোমার এই সুযোগ অর্জুন সিং। এমন সুযোগ আর মিলবে না। আমরা সবাই তোমার পিছনে আছি। দলু সর্দার শুধু তোমার দাদো, তোমার বাপের শ্বশুর নয়, তার নোকরীও করেছে, নিমকও খেয়েছে। বিশ বছর ধরে এর জন্তে অনেক কষ্ট সয়ে অনেক কৌশল করে সব আয়োজন করে রেখেছে। ছত্রিশ জাতিয়ার জঙ্গলগড় গড়ে তুলতে কি কম মেহনত করেছি? কম তকলিফ সয়েছি? লোকের জান গিয়েছে। অরে আমাশয়ে কি কম মানুষ মরেছে। ওষুধ এখানে আছে। গাছের শিকড়,

সে দলু জানে। সে ছাড়া আর এক শিখিয়ে রেখেছে তোমার মা রুক্মিণীকে। হঠাৎ যদি মরে সে—তবে! তবে যে বিলকুল বরবাদ হবে। ওষুধ থাকতেও ওষুধ খেয়েও মরেছে মানুষ। এক এক বছর এমন হয়েছে যে এখান থেকে পালাবার জন্তে লোকে পাগল হয়ে উঠেছে। এখানকার মাতাজীর পূজা দিয়েছি। বরার রক্ত দিয়েছি। নিজেরা বুক চিরে রক্ত দিয়েছি। এক একবার তবু মাতাজী প্রসন্ন হন নি। ফের পূজা দিয়েছি। তারপর কমেছে।

দলু সর্দার অনেক বুদ্ধি ধরে। কুমর অর্জুন সিং সে লোকদের জোর জবরদস্তি করে ধরে রাখে নি। তার বুদ্ধি আছে, সে এই বারো পাহাড়ের মানুষরাবর ক্ষেতি করিয়েছে। কেটে-কুটে পাহাড়ের গায়ে জমিন করে তাতে জোয়ার ভুট্টার চাষ করিয়ে প্রতিটি পাইককে জমি দিয়েছে। চাষ করো, খাও, ছোটখাটো হোক বেশ মজবুদ মজবুদ ঘর বানিয়ে দিয়েছে। মাটিতে পাথরের চাঁইয়ে দেওয়াল গেঁথে শাল কাঠের চাল কাঠামো করে ঘাস দিয়ে ছাইয়ে খাসা ঘর হয়েছে। সর্দারদের ঘর বড়। তোমার ঘর সকলের থেকে বড়, সকলের থেকে ভাল। তোমার জন্তে রাজার ছেলের মত ঘরও বানাতে পারত, তা বানায় নি। বাইরের লোকের চোখ পড়বে। এখানেও বহুৎ লোকের হিংসা মনে হবে। বাইরের লোক জানে এরা সব ছত্রিশ জাতিয়া। তা জানুক। ছত্রিশ জাতিয়াদেরও সে বাঁচিয়ে রেখেছে। ওরা আর সেই ন্যাংটা নেই। ওরাও এখন প্রায় পাইক হয়ে উঠেছে। এখানকার সাপকে জব্দ করেছে ওরা। প্রতি বছর সাপ মারিয়েছে দলু সর্দার। সাপের কামড়ে প্রথম প্রথম লোক কম মরে নি। লোক মরেছে, গরু মরেছে, ঘোড়া মরেছে। সাপ এখনও দশ বিশটা আছে, তবে লুকিয়ে থাকে। ওরাও মানুষকে ভয় করতে শিখেছে। বিশ বছরে বাঘের পেটে ভালুকের আঁচড়ে বুনো বরার দাঁতে তাও অনেক আদমী গিয়েছে। তাদেরও মেরেছে।

নদীর ধারে স্যাঁতসেঁতে জবজবে জমি এখন অনেক শুখা শুখা হয়েছে। নালা কেটে কেটে নদীর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। সেখানে কিছু কিছু ধান হয়। লোহার বাগ্দা এনে কামারশাল করেছে। হাতিয়ার শানায়, বানায়ও। লুটেপুটে হাতিয়ারও জড়ো করেছে অনেক। ছুতার তৈরি করেছে।

ছত্রিশ জাতিয়া গড়ের বারো পাহাড়ে, পাহাড়ে পাহাড়ে যেখানে যেখানে জোড়, সেখানে সেখানে মোটা মোটা কাঁটা গাছ, বড় বড় বট অশ্বত্থ গাছ লাগিয়ে তার আড়ালে মজবুত মজবুত ঘাঁটি বানিয়েছে। আর নদী মালী যেখানে ঢুকেছে, আর যেখানে ঝোরার মুখে ঝরে পড়ে চলে গিয়েছে, এই দুই মুখে দুই দুই ঘাঁটি রেখেছে। সব জায়গায় আছে নাকাড়া। গাছের উপর মজবুত মাচান করা আছে। দেশে মুল্লুকে ঝঞ্ঝাট হলে মাচানে পাইকরা বসে যায়। পাহারা দেয়। বড় বড় পাথর জমা করা আছে। গড়িয়ে দিলে সিপাহী ঘোড়া গুঁড়িয়ে যাবে, হাতী পর্যন্ত খোঁড়া হয়ে যাবে। এখানকার চারিপাশে গাঁওয়ের লোকের সঙ্গে কোন ঝগড়া রাখে নাই। তাদের চুলেও হাত দেয় না। অনেক দূর দূর গিয়ে তারা গাঁও থেকে ধান আদায় করে আনে। দূর থেকে হাট লুট করে আনে কাপড় মসলা তেল সরষা। সব জিনিস আনে। আয়না আনে, কাঁকুই আনে, দস্তার গহনাও আনে। টাকা আনে। কাছের হাটে ঠিক দাম দিয়ে কেনে। এখান থেকে দু কোশ দূর দিয়ে গিয়েছে বাদশাহী

সড়ক। সেখানে যাত্রীদের উপর কোন হামলা করতে দেয় না। শ্রেফ রাস্তা পাহারা দেয় বলে মানুষ পিছু এক পয়সা আদায় করে নেয়। তবে লুট করে অনেক দূরে। সে সবই অন্য জায়গায় পাইকদের নামে যায়।

কুমর অর্জুন সিং, তুমি বিশ বছরের হয়েছ। তোমার বাপের মত জোয়ান তুমি। গোঁফও তোমার বাপের মত। চোখ দুটোও তেমনি মোহনিয়া। রঙটা শ্যামলা হয়েছে সে তোমার মায়ের জন্যে। সাহসও তোমার খুব, বীরও তুমি বাপের মত। ভৈরবের সঙ্গে লাঠি ধরতে পার। আমার সঙ্গে তলোয়ার। তীরধনুকেও ওস্তাদ। সব থেকে তোমার হিম্মত সড়কিতে। গত দু বছরে দুটো বাঘ মেরেছ। একটা চিতা, একটা ডোরা। তুমি ডোরাটাকে এক সড়কিতে প্রায় এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করেছ। সাবাস! সাবাস! সাবাস! কিন্তু তুমি মাতাল হয়ে গেছ; বড় বেশি দারু খাও। দারু পেলে জলের মত ঢক ঢক করে খাও। নেশায় হুঁশ থাকে না। কখনও কখনও বেহেড্ হয়ে যাও। আর বড় রাগীদার। তোমার মা আমার বেটী। বেটী বলে বলছি না, এখানকার সবাই বলে, তুমিও বলবে যে এ মেয়ে এ মা যেমন তেমন নয়—সাক্ষাৎ দেবী। খাঁটি রাজপুত রাজার রাণী। তাকে আমি সুরতিয়াবাঈয়ের কাছে নাচা-গানা শিখিয়েছিলাম। সে এখন সেই তার কিষণজীর কাছে ভজন ছাড়া কোন গীত গায় না, কেশে সে তেল দেয় না। ব্রাহ্মণের বিধবার মত এক বেলা এক মুঠি খায়। বাঘের চামড়ায় শোয়। তার মুখে আজ বিশ বছরের মধ্যে, এই তুমি যখন ছোট ছিলে, যখন তুমি খলখল করে হাসতে তখন হাসি দেখেছি, আর হাসি দেখি নি। বেটীকে এখন দেখলে মনে হয় সে যেন মনে মনে কাঁদছে কাঁদতে কাঁদছে। তার আর বিরাম নেই। কেন? শ্রেফ তোমার জন্যে। তুমি তার মনের মত হলে না অর্জুন সিং। তুমি লাঠি শিখলে, তলোয়ার শিখলে, সড়কি শিকলে, বীর হলে, কিন্তু রাজার ছেলের সহবৎ শিখলে না কেন?

তোমার মা আমার বেটী, নইলে তাকে প্রণাম করতাম। কেন জান? গোড়াতে আমি তোমাকে বলতাম কুমর অর্জুন। ভৈরবও বলত। তোমার মা বারণ করেছিল। বলেছিল, না বাপ, না। কখনও বল না। বাচ্চা বয়স থেকে কুমর কুমর শুনে মগজ যদি খারাপ হয়ে যায় তবে বিপদ হবে। বাপ, তুমি সর্দার, তোমার নাতি—এতেই তো সবাই খাতির করবে। তাতেই হয়তো মগজ গরম হবে। তার উপর 'কুমর' বললে সে ওর পক্ষে বহুৎ খারাপ হবে। তা ছাড়া বাপ, ওকে যদি কুমর বল তবে ক্রমে ক্রমে এ কথাও তো বাইরে ছড়াবে। কে 'ওখানকার অর্জুন সিং, রাজার ছেলে কুমার সাহেব? তখন লোকে জিজ্ঞাসা করবে, কোন্ রাজার ছেলে? কোথাকার কুমার? ছত্রিশ জাতিয়ার মধ্যে কুমার কি করে এল? কোথা থেকে এল? তখন? চন্দনগড়ের নাম যদি ছড়ায় তবে তো বিপদ হবে বাপ!

বুঝে দেখ অর্জুন কত বুদ্ধি ধরে আমার বেটী। সে ঠিক বলেছিল। তা হলে তোমাকে বাঁচানো, এই জঙ্গলগড় তৈরি করা বিপদ হত। আজ বিশ বছরের চন্দনগড়ে মাধব সিং-এর কথা লোকে ভুলে গেছে। জানে রুক্মিণীবাঈ কোথা মরে গেছে কি কোথায় চলে গেছে। আজ এখানকার লোকেরাও ঠিক জানে না। সে আমলের বুড়ো বুড়ী নাই। আমার বয়সী

আছে ভৈরব আর গোবর্ধন, তাদের বউরা। তারাও চেপে আছে। অল্পবয়স মনে আছে সে আসলে বারো থেকে বিশ তিরিশ বছরের ধারা তাদের। কিন্তু সে অল্প। আমরা ওটার উপর জোর দিই নি বলে তারা আপনা-আপনি ভুলেছে। জোর দেব না। কেউ মনে করিয়ে দিলে মনে পড়ে। তারা তোমাকে দলু সর্দারের নাতি, আমার পরের সর্দার বলেই জানে। তবে তোমারও গুণ আছে। তুমি বীর, তুমি খুব হাসতে পার, খুব দিলদরিয়া তুমি। খুব হৈ হৈ করতে পার, সব থেকে বড় গুণ সকলকে ভালবাস। আপন পর নাই। কিন্তু দোষ তোমার তা থেকেও অনেক বেশী। তুমি এমন মায়ের ছেলে, রাজা মাধব সিং-এর বেটা। খাঁটি ছত্রি হয়ে তুমি সহবৎ শিখলে না, ধীর হলে না। তোমার মা স্বরতিয়াবাঈয়ের কাছে লেখাপড়াও কিছু শিখেছিল। তোমার মা তোমাকে লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছিল, তুমি শিখলে না। তুমি মদ খাও। তুমি ওই ছত্রিশ জাতিয়াদের সঙ্গেও মদ খেয়ে হুল্লোড় কর। তাদের জোয়ানী বেটীগুলোকে নিয়ে খেলা কর। পাইকদের বেটীদের সঙ্গে মেলামেশাও কর। কিন্তু পাইক-দের বারণ করা আছে, তারা মেয়েগুলোকে শাসনে রাখে। কিন্তু ঝুমঝুমিকে নিয়ে তুমি মেতে আছ। তোমার মাকে পর্যন্ত মেনে নিতে হয়েছে তা। তবে ঝুমঝুমি তো ভাল মেয়ে।

ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গলগড়ে এখানকার দেবীপির বারণ আছে জাত মানা। তবু অর্জুন সিং-তুমি কুমর, রাজা মাধব সিং-এর বেটা। তোমার একটা জাত আছে। জাত না মান, ইজ্জত আছে। ইজ্জত না থাকলে সব হওয়া যায় অর্জুন সিং—সে রাজা হয় না, কুমরও হয় না।

তবু ভাবছি অর্জুন সিং, তুমি যাই হও—মাতাল হও, মুরুখ হও, হাল্লাবাজ হও—এইবার তোমাকে সব বলে, ওই পাথরের বেদীর উপর কাঠের চৌকি পেতে তোমাকে বসিয়ে, তোমার হাতে তোমার বাপের তলোয়ারখানা দিয়ে বলব—এই নাও তোমার বাপের তলোয়ার। এই তোমাকে আমরা সবাই বললাম রাজা। তোমাকে বললাম সব বৃত্তান্ত। তোমার বিশ বছর বয়স হল, এদিকে কিষণজীর খেলায় আবার লাগল গোলমাল। এবার তুমি যা হয় কর। মীর হবিব এই পথে আসবে শুনছি। চন্দনগড়ের সুচেত সিং-এর সঙ্গে তার দোস্তি টুটেছে। এবার দুশমন! এবার সে সুচেত সিং-এর দুশমন।

গত বার এই ক মাস আগে এই বৈশাখ মাসে একটা সুযোগ চলে গেছে। গতবার উড়িষ্যা দখল করে, মীর হবিব এই জঙ্গলের ধার দিয়েই গিয়েছিল; মেদিনীপুর দখল করে তাঁবু গেড়ে বসেছিল। চন্দনগড়ের সুচেত সিং তখনও দোস্ত। চন্দনগড়ে খানাপিনা করে সেলামী নিয়ে তাকে খেলাত দিয়ে মেদিনীপুরে ছাউনী গেড়েছিল। কি সাবধানেই তখন রাখতে হয়েছিল তোমাকে এবং কি সাবধানেই ছিল ছত্রিশগড়ের তামাম পাইকেরা। তোমার তখন বেমার।

লোকে বাচ্চা ঘুম পাড়ায়, অর্জুন সিং, বর্গীর ছড়া বলে, "ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল বর্গী এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দোব কিসে।" ঠিক সেইরকম করেই ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গলগড়ে পাইকরা ঘুমের ভান করে পড়েছিল। তবু তুমি দুরন্ত দুর্দান্ত, তোমার কয়েকটা দুরন্ত সঙ্গী নিয়ে বেরিয়ে পালিয়েছিলে। তখনও তোমার বেমার হয়নি। পথের ধারে জঙ্গলের উঁচু গাছে চড়ে বর্গীদের যাওয়া দেখতে গিয়েছিলে। তোমার মায়ের পুণ্যবল আর তোমার

নসীব। তোমার একটা ফাঁড়া ছিল সেটাই তোমাকে বাঁচালে। ওই গাছে কিসে তোমাকে কামড়ালে, তার জ্বালাতে তুমি গাছ থেকে নেমে নদীর জলে পড়লে; হুঁশ হারালে। সঙ্গীরা তোমাকে নিয়ে এল, তখন সর্বাঙ্গ তোমার ফুলেছে। আর তোমার সঙ্গে ছিল ঝুমঝুমি। দু মাস ভুগে প্রাণে বাঁচলে। দলু সর্দারের বুদ্ধি আর ধরম যিনি তাঁর মহিমা, অর্জুন সিং। তোমাকে চিকিৎসা করে বাঁচালে ওই ছত্রিশ জাতিয়ারা। আর ওই মেয়েটা ঝুমঝুমি। ওদের যে সাপের ওস্তাদ সেই করলে চিকিৎসা। আর সেবা করেছে ছত্রিশ জাতিয়ার মেয়েটা ওই ঝুমঝুমি। তোমার পেয়ারী। সে ওই সাপের ওস্তাদেরই বেটী। ওই যে কালো নাগিনের মত ছিপছিপে লম্বা বেটীটা, যার চোখ দুটো লম্বা ছুরির মত, নাকটা একটু ছোট, মনে হয় সূচলো নাকের ডগাটাকে কনী দিয়ে কেউ একটু টিপে মেজে দিয়েছে। তাতে বাহার খুলেছে খুব। ঠোঁট দুটো পাতলা, কপালটা ছোট, চুল একরাশ, কিন্তু করকরে কোঁকড়ানো। হাসলে গালে টোল পড়ে; কোমরখানা এতটুকু—যাকে নিয়ে তোমার পাগলামীর শেষ নেই। নামটাও—ঝুমঝুমি। বহুৎ মিঠা মেয়েটা, ছেলেবেলা ভাল নাচত, চব্বিশ ঘণ্টাই প্রায় নাচত বলে দলু সর্দারই হাট থেকে গোটা দশেক ঘুঙুর এনে দিয়েছিল; তাই গেঁথে পরে ঝুমঝুম্ করে নাচত। নাচই হয়ে গিয়েছিল ঝুমঝুমি। হায় হায় হায়! তখন কি দলু জানত যে ওই কালুটে রোগা মেয়েটা বড় হয়ে এমন হবে যে অর্জুন সিং-এর মন ভুলাবে! এমন খুবসুরতি হবে! এমন দুরন্ত হবে যে অর্জুনের সঙ্গে পাল্লা দেবে! তুমি বন্শী বাজাও ভাল, ছোকরী নাচে ভাল। বনের ভিতর গিয়ে তুমি বন্শী বাজাও আর মেয়েটা বেহায়ার মত নাচে তা দলু শুনেছে। তুমি শিকারে যাও, ও গাঁওয়ের ধারে বসে থাকে গাছে চড়ে কখন ফিরবে কোন পথে ফিরবে তার জন্তে।

ভাইয়া, তোমাকে চুপি চুপি বলতে পারি, দলু মনে মনে তোমার তারিফ করে। রুচির তারিফ করে। দলু যদি জোয়ান হত তোমার মত তবে তোমার সঙ্গে ওই ছোকরীর মালিকানা নিয়ে লড়াই হয়ে যেত। জোয়ানী বয়স তোমার—এ হবে। কিন্তু তোমার মায়ের যে মুখ তার। আর বাড়াবাড়িটা বড় বেশ করছ।

দলু সর্দার খানিকটা তামাক খরসান ঠোঁটে টিপে নিয়ে পিচ ফেলে ভাল করে নড়েচড়ে বসল। ভীম বাগ্দীর ছেলে গণ্ডারের আনা বালেশ্বরের খবর শুনে সে গণ্ডারকে পাঠিয়েছে রুক্মিণীকে খবর দিতে। রুক্মিণী সকালে স্নান করে কিষণজীর সেবায় লাগে। তাকে শয়ান থেকে ওঠানো, মুখ ধোওয়ানো, বেশ করানো, বাল্যভোগ দেওয়া, কাঁসরঘণ্টা বাজিয়ে আরতি করা। অনেক কাজ তার। অহল্যা বুড়ি হয়েছে, সে তাকে সাহায্য করে। অধিকে নেই, সে মরেছে। বাগ্দীদের দুই বিধবা আছে, দুই কুমারী আছে, তারা কিষণজীর মন্দির উঠান ঝাঁট দেয়। তাদের নিয়েই দিন কাটে রুক্মিণীর। ছেলের নাম বড় করে না। বলে—ভাগ্য! আমি কি করব!

ফুরসত তার কম, খুব কম। তাই গণ্ডারকে বলেছি দাঁড়িয়ে থাকবি, ফুরসত পেলেই বলবি, বহুৎ জরুরী কাম, তোমার বাপ বসে আছে। কথা না হলেই নয়। এবং এসে তাকে খবর দেবে। সে যাবে রুক্মিণীর কাছে।

পাঁচ

খরসান ঠোঁটে টিপেও বেশ জমল না দলুর। সে ডাকলে, ঝুমরি!

ঝুমরী আজও আছে। বুড়ি হয়েছে। সেই তার সেবা করে। সে বেরিয়ে এল। ঝুমরীর পরনে এখন মোটা তাঁতের শাড়ি। আঁচলটা খুব বাহারে। হাতে মোটা কাঁসার কাঁকনী। গলায় মোটা পুঁতির মালা, রূপদস্তার হার। হাজার হলেও সে সর্দারের দাসী।

—কি?

—মদ দে।

ঝুমরী বিনা বাক্যব্যয়ে মদ এনে দিল। একটা ঠোঙায় এনে দিল খানিকটা ময়ূরের মাংস।

খেয়ে সে বসে আপন মনেই ঘাড় নাড়তে লাগল। অর্থাৎ নিজের মনের সঙ্গেই কথা বলছিল।

ঝুমরী বললে, উ কি হচ্ছেক? অঁ?

—কি হচ্ছেক?

—আপন মনে ঘাড় লাড়ছ?

—ঘাড় লাড়ছি ভাবছি তুকে কাটব ওই মায়ের থানে।

—ক্যানে, বুড়া বয়সে ছুকরীর শখ হয়েছে নাকি? বুড়িকে কেটা পথ সাফ করবে?

—হুঁ। তুর মাথা।

—কি করবেক? খাবেক?

—তুর বুড়া মাথা খেয়ে কি হবেক? কি সুখ মিলবেক? তার চেয়ে ওই ঝুমঝুমির মাথাটা এনে দিতে পারিস?

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ঝুমরী। ঝুমঝুমির সঙ্গে অর্জুনের ভালবাসার কথা ছত্রিশ জাতিয়ার জঙ্গলে মানুষ জানে, জন্তু জানে, পাখিরা জানে, গাছেরাও জানে। বুড়ো দলু তার দাদো। কিন্তু এখানে এই মুল্লুকে তো এসব ব্যাপারে দাদো নাই নাতি নাই, দাদা নাই ভাই নাই। হয়তো বাপ বেটাও নাই। ঝুমরী দলুর জন্যে সব পারে। কিন্তু এ যে নাতি—যে-সে নয়। এ যে অর্জুন। ঝুমঝুমি যেমন সবার মনে দোলা দেয়, অর্জুন তেমনি—না, তার চেয়েও বেশি দোলা দেয় সবার মনে সবার বুকে। আর সে তো যে-সে নয়—সে অর্জুন। ঝুমঝুমির মাথা যে খাবে তার কলিজা সে ছিঁড়ে নিয়ে চটকাবে, খাবে।

হঠাৎ দলু বললে, শোন্। ইখানে আয়।

ভয়ে ভয়ে সে এগিয়ে এসে বললে, কি?

—মেয়েটাকে—

গলা শুকিয়ে যাচ্ছে দলুর। ঝুমরীও কাঠ হয়ে গেছে। তবুও দলু বললে ফিস ফিস করে, মেরে ফেলতে পারিস?

ঝুমরীর মুখটা শুধু হাঁ হয়ে গেল।

দলু বললে, ওরে, অর্জুনের নেশা না ছুটলে যে চলবে না রে।

ঝুমরী বললে, একটা কথা বলব রাগ করবে নাই তুমি ?

—না।

—তা হলে তুমার অজুন বাঁচবেক নাই। আর তার আগে তুমাকে আমাকে মেরে ফেলায়ে বুকে চড়ে নাচবেক। তারপরে নিজে মরবেক।

—হুঁ। তা সত্যি। ঘাড় নাড়লে দলু।

—তবে ? আর নেশা ছুটায়ে বা কি হবেক। ছুটিতে উরা কেমন নেচে গেয়ে বেড়ায় বল দিকিন।

—হুঁ তা বটে। ভেবে দেখি। তুকে আজ রেতে সব বলব। সব শুনে বুঝবি ক্যানে বলছি।

গণ্ডার এসে দাঁড়াল—সর্দার—

—হয়েছে রুক্মিণীর ?

—হাঁ, তুমার তরে বসে রইছে।

—চল্ ঝুমরী।

—আঁ।

—মুখটা হাঁ করবি তো জিভটো ধরে টেনে ছিঁড়ে লিব। বুঝলি ?

—বুঝলাম, মুখ আমার হাঁ হবেক নাই।

—আচ্ছা।

রুক্মিণী বসে ছিল তার অপেক্ষায় ; দলুর জন্যে একটা কাঠের পিঁড়ি পেতে রেখেছিল। পাইকদের ঘরে পিঁড়ি আছে। তবে ব্যবহার নেই। রুক্মিণী রাণী ছিল, সে বাপকে পিঁড়ি পেতে দিয়েছিল। সে পিঁড়ি ব্যবহার করত। রুক্মিণী বললে, বস বাপ, জরুরী খবর কিছু নাকি ? তোমার গণ্ডারের যে তাগিদ ! গণ্ডারের মত ঠায় দাঁড়িয়ে, নড়ে নি।

গণ্ডারের দেহের আকারের জন্য আর ধৈর্যের জন্য নাম গণ্ডার। আসল নামটা হারিয়ে গেছে।

রুক্মিণী একটু হাসলে, কিন্তু দলু হাসলে না। বললে, হাঁ মা, খবর জরুরী আর জোর। জবর বল জবরও বটেক।

—কি ?

গণ্ডারকে বললে দলু, বোল্ রে—তুই বোল্।

গণ্ডার স্বল্পভাষী। সে বললে, বর্গীরা বালেশ্বরে ফের জমছে।

—সব বোল্ না রে উল্লুক।

—তুমি বল।

—আমি বলব ? সে রুক্মিণীর দিকে তাকিয়ে বললে, চার মাহিনা হয় নাই নবাব আলিবর্দী বর্গীদের কটক ছাড়া করে দিলেক, সে জান। বদমাশ বর্গী আর মীর হবিব যখন মেদিনীপুরে

ছাউনি ফেলে তখন সুচেত সিং অনেক টাকা দিয়েছিল। তাও জান। কিন্তু বর্গীরা যখন নবাবের ভয়ে পালায়, নবাব যখন মেদিনীপুরের ওপারে এসেছে—কাঁসাই পার হচ্ছে, তখন সুচেত দেখলেক বিপদ। নবাব তাকে পাকড়াবে বর্গীর দোস্ত বলে, আর তার সঙ্গে জুটল লুটের লোভ। বর্গী যখন চন্দনগড় পাশে রেখে পালাইছে তখন সুচেত সিং বর্গীর পিছন দিকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লুটে নিলেক। শুনেছি. রসদ আর মালখানার অনেক কিছু পেয়েছিল।

রুক্মিণী বললে, সেও আমি জানি বাপ। তখন অর্জুন রোগে প'ড়ে। আমি কিষণজীর দোরে ধর্না দিয়েছি তবু এ সব আমার কানে এসেছিল।

—মা! আমি তোমাকে তো এসব শোনাই না। কেন না, তুমি দুখ পাবে। দুখ পাবে অর্জুনের লেগে। আমারই কি কম দুখ হয়েছিল মা। তখন একটা কত বড় সুবিস্তা মিলেছিল। অঃ! সেদিন যদি অর্জুনকে নিয়ে দলবল জুটে ওই শিয়ালের মত ছুটে পালানো ওদের পথ রুখে ওই নেকড়ে ওই মীর হবিবটার গর্দান নিয়ে মুণ্ডুটা বর্শায় গেঁথে নবাব আলিবর্দীর কাছে হাজির হতে পারতাম আর তোমাকে সঙ্গে নিয়ে নবাবকে দেখিয়ে তোমার দুখ শুনাতাম, তা হলে সব শোধবোধ হয়ে যেত মা। নবাব আলিবর্দী যেমুন বীর তেমুনি আদমী সাচ্চা। ঔরতের লালস্ নাই। জীবনভোর এক বেগম; তার তিন বেটী। বেটীর দরদ সে বুঝত মা। তুমি যদি বলতে সুচেত সিং-এর বেইমানির কথা, দুমুখো সাপের কামের কথা তাহলে ঠিক বিশ্বাস করত নবাব।

রুক্মিণী অতি বিষণ্ণ করুণ হেসে নিজ কপালে হাত দিয়ে বললে, আমার ললাট!

—হাঁ মা, লালাট। তা ছাড়া কি বলব!

—বল বাপ, আজ কি বলচ বল।

—বলছি মা। সবটা সমঝে নিতে হবে মা। তাই বলছি, নবাব কটক পর্যন্ত গিয়ে দখল করলে কটক, সে জান।

—হাঁ বাপ।

—মীর হবিব কটক পার হয়ে যে জঙ্গল সেই জঙ্গল হয়ে চটল। কেল্লাতে রেখে গিয়েছিল সৈয়দ নূর, ধরম দাস আর সরন্দাজ খাঁকে। তারা যখন কেল্লা নবাবের হাতে দেয় তখন নবাবের সঙ্গে তকরার করেছিল সরন্দাজ খাঁ পাঠান। নবাব সঙ্গে সঙ্গে তার গর্দান নিয়েছিল। সুচেত সিং নিয়েছিল তার গর্দান, সে ছিল নবাবের কাছেই।

—বকশিশ খেলাত মিলে থাকবে সুচেত সিং-এর। হাসলে রুক্মিণী। অথচ শুনেছি পাঠান সর্দারের সঙ্গে সুচেত সিং-এর বহুৎ দহরম-মহরম ছিল।

—হাঁ মা, তা ছিল। আবার রাগও ছিল ভিতরে ভিতরে। সরন্দাজ খাঁ সুচেত সিং-এর মুর্শিদাবাদ থেকে আনা এক বাঈকে চেয়েছিল। নিয়েও গিয়েছিল।

—এ খবর নতুন বাপ জানতাম না।

—হাঁ। এখন নবাব এক কোথাকার কে আবদুস শোভানকে কটকের নাজিম করে ফিরল মুর্শিদাবাদ; মীর হবিব নেকড়েও সঙ্গে সঙ্গে ফিরল—আর শোভানকে হারিয়ে কটক দখল

করলে। বেওকুফ বদমাশ শোভান বনে এখন তাকাইতি করছে তা জান। মুর্শিদাবাদ যেতে পারছে না নবাবের ভয়ে।

—হাঁ। এ খবর জানি।

—তবে তো তুমি সবই জান মা।

—সব জানি বাপ। কিন্তু কি করব জেনে? ওই মাতাল বুদ্ধিহীন একটা ছত্রিশ জাতিয়ার মেয়ে নিয়ে পাগল ছেলে, তাকে যে বলতে সরম লাগে আমার—তুই রাজার বেটা। তোর বাপকে এমনি করে কেটেছে, তুই শোধ নিয়ে আয়। উল্টো ফল হবে বাপ। হয়তো এমন কথা বলবে যা শুনে আমার তখুনি তখুনি মরা ছাড়া পথ থাকবে না।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ঝরে পড়ল তার বুক থেকে।

—কেন মা? কি বলেছে অর্জুন?

এবটু চুপ করে রুক্মিণী বললে, একদিন ওকে ডেকে বললাম, তুই এমন করে মদ খাস, ওই ঝুমঝুমিকে নিয়ে বনে বনে ঘুরিস, তুই সর্দারের নাতি, তোর সরম হয় না? সে বললে, তা কেন হবেক। উতে দোষটা কি? বড় হয়েছি মদ খাব, ছুকরী নিয়ে আমোদ করব তো কিসের সরম? সবাই তো করে। দাদো মদ খায়। দাদোর ঘরে ঝুমরী আছে।

দলু মাথা হেঁট করে বললে, হাঁ বেটী, তা তো উ বলতে পারে।

রুক্মিণী বললে, এখনও শোন বাপ, কথা তো শেষ হয় নাই আমার। তুই যা রে গণ্ডার এখান থেকে। তখন আমি বললাম, তোর দাদো সর্দার। তার বেশি তো নয়। তুই যদি তার বেশি হস? সে হেসে বললে, কি? রাজার বেটা? হুঁ—শুনেছি—তোমরা গুজগুজ করে বল। তা রাজার দাসীর বেটা কি রাজপুত্তুর হয়? নবাবদের বাঁদী থাকে, রাজাদের দাসী থাকে—এমন বেটাও কত থাকে।

দলুর সারা শরীর শক্ত হয়ে উঠল। সে হিংস্রভাবে বললে—মা!

রুক্মিণী বললে, কার উপর রাগ করছ বাবা, একটা জানোয়ার জন্মেছে আমার পেটে। আমি বললাম, বস্ তুই, সব শোন্ তাহলে। কিন্তু জন্তুটা বললে, কি শুনব? শুনে কি করব? বাবা মরে গিয়েছে, তোকে ফেলে দিয়ে গিয়েছে রাস্তায়। আমি পথে হয়েছি গাছতলায়; আমি সব জানি। কি শুনব? আমি চললাম, ঝুমঝুমি বলে আমার লেগে বসে আছে। আমি রাগ করে বললাম, তোর ঝুমঝুমিকে আমি বাবাকে বলে কেটে ফেলব। সে বাপ এক লহমায় যে কি হয়ে গেল তোমাকে কি বলব, দাঁতে দাঁত টিপে বললে, কি বললি? তা হলে—। আমি ভয় পাই নি বাপ। আমার মাথায় খুন চেপেছিল। সামনে গিয়ে বললাম, কি করবি তাহলে? নে—মার্ আমাকে। মার্! মেরে ফেল্। কি বলব বাপ—আঁ-আঁ চিৎকার করে সে ওই শালগাছটার মোটা ডালটাকে টেনে মড়মড় করে ভেঙে আছড়ে ফেলে বললে, এই লে। আমি অবাক হলাম বাপ। এ যে দানো একটা। রাগও হল। বললাম, ওরে, তুই তবে মর্, তুই মর্, তুই মরলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারব। বলেই আমি কিষণজীর পায়ে পড়ে বললাম, বল কি করব? বল? পড়েই ছিলাম। কিছুক্ষণ পর ঝুমঝুমি এসে ডাকলে, মা গো, মায়ী! আমি জবাব দিই নি। সে কাঁদতে কাঁদতে বললে, ওগো

মায়ী, তুমার পায়ে পড়ি গো, শীগ্রি এস গো। দেখ গো তুমার অর্জুন কি করছেক গো। আর আমি থাকতে পারলাম না বাপ। বেরিয়ে এলাম। দেখলাম ঝুমঝুমির দুই চোখে জলের ধারা বইছে। বললাম, কি হল? সে বললে, দেখসে মায়ী সে কি করছে। এস। গেলাম তার সঙ্গে, গিয়ে দেখলাম বনের ভিতর ধুলোয় পড়ে কাঁদছে, মধ্যে মধ্যে বুক চাপড়াচ্ছে আর বলছে, মরে যাই আমি মরে যাই ঠাকুর, আমাকে মার, আমাকে তুমি মার। মা বলছে—মর্ মর্। অনেক বুঝিয়ে উঠিয়ে নিয়ে এলাম। মনে মনে ঠিক করেছি বাপ এবার তোমাদের নিয়ে আমিই লড়াই করব। দুশমনের সঙ্গে। মরব লড়াইয়ে। ও থাকবে এইখানে। আর যারা থাকতে চায় থাকবে এই ছত্রিশ জাতিয়াদের সঙ্গে জাত হারিয়ে জন্ম হারিয়ে কুল হারিয়ে বংশ পরিচয় হারিয়ে।

দলু মাথা হেঁট করে রইল। কি বলবে ভেবে পেলে না।

রুক্মিণী বললে, আমাকে রাণী করে তোমরা লড়তে পারবে না বাপ?

—খুব পারব মা। খুব পারব। সেই ভাল হবে মা, সেই ভাল হবে।

—তা হলে তাই হবে। তুমি ডাক সকল পাইক মাতব্বরকে।

—ডাকব মা, আজই ডাকব।

—আজ নয় বাপ, আর পাঁচটা দিন সবুর কর। পাঁচদিন পর সেই তারিখ হবে বাপ—যে তারিখে আমার রাজাকে দুশমনেরা কেটেছিল।

—ঠিক আছে মা, তাই হবে। তবে আমি সব তৈয়ার রাখতে বলি। কি বল?

—তা বল। কিন্তু গণ্ডার যে বললে খবর এনেছে, জরুরী জবর খবর। এ পর্যন্ত যা বললে তা তো পুরনো।

—হাঁ হাঁ হাঁ। তুমি আমার বেটী কিন্তু তুমি সত্যিই রাণীর বুদ্ধি ধর। এখন বালেশ্বরে মীর হবিব আবার এসে হাজির হয়েছে। নবাব মুর্শিদাবাদে। বুড়ো হয়েছে নবাব। তিয়াত্তর বছর বয়স হয়ে গেল। সেখানে গিয়ে বেমারী-ত পড়েছে। উঠেছে, তবে খুব কাহিল। মীর হবিব এ মওকা ছাড়ে নি, একদম হাজির হয়েছে বালেশ্বরে। বর্গীপল্টন নিয়ে এসেছে মোহন সিং। আর এসেছে মুস্তাফা খাঁ পাঠানের ছেলে মুর্তাজা খাঁ। সরদার খাঁর ছেলে এসেছে। তারা এবার সব থেকে আগে পড়বে চন্দনগড়ের উপর। এর চেয়ে বড় মওকা আর কি হবে বেটী?

রুক্মিণীর চোখ জ্বলে উঠল। বললে, ঠিক আছে বাপ, সব তুমি তৈয়ার কর। বল, বর্গী আসছে ফের। আমাদের তৈয়ার হতে হবে। শুধু বলবে না যে আমি তোমাদের সঙ্গে যাব রাণী হয়ে। কথাটা বাইরে বেরুলে বিপদ হবে।

দলু বেরিয়ে এল। গণ্ডার অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার অপেক্ষায়। পথে অহল্যার সঙ্গে দেখা হল। অহল্যা আপন মনে বকতে বকতে আসছে উদিক থেকে। 'মা ছেলে বলে দেখবেক নাই। দাদো কিছু বলবেক নাই। এত বড় ছেল্যা হল, ঝুমঝুমি মেয়েটাকে নজরে লেগেছে তার, নিয়ে নিয়ে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াইছে। তাই তাকে রাখনী করে রেখে দে ঘরে। ছেল্যাটা ঘরে থাকুক—তা না; ই এক আচ্ছা

কাণ্ড বটেক!'

দলু চিন্তিত মনেই চলেছিল। অহল্যা তাকে দেখে বললে, ছোঁড়াটা চলে গেল।

—চলে গেল? ছোঁড়াটা? কে? অর্জুন?

—তা না তো কে? কার এত বুকের পাটা হবেক বল্? আপন খুশীতে কাম করবেক?

—কোথাকে গেল?

—ওই গেল সেই শঙ্করীপুর। কাল মহাষ্টমীতে মেলাই পাঁঠা কাটবেক, তার পরেতে বীর ষ্টমীতে সং খেল হবে—লাঠি, কুস্তি। ওই, ওই তো রইছে তোমার সঙ্গে তার এক চেলা। ওই যে শালা গণ্ডারে। উ যে কুস্তি লড়বেক। উও তো যাবেক। বলেছে, তোমরা এগোও, আমি যেছি। সর্দারকে খবরটা দিয়েই আমি ছুটব। পঁচিশ তিরিশটা ছোঁড়া গেল তার সাঁতে, আর সেই ঝুমঝুমিকে নিয়ে সাত আটটা ছুঁড়ি।

—কখন গেল?

—তা ঘণ্টুয়ার পারাইলো। পথে পড়েছে এতক্ষণ।

দলু বললে, এই গণ্ডারে।

—অ্যাঁ!

—তু বলিস নাই আমাকে? হারামজাদা?

—অর্জুন সর্দার যে বললেক, কাউকে বলতে হবে নাই। আমার সাঁতে যাবি ভরটা কিসের। সি ফিরে এসে বলব, যা বলবার আমি বলব। বললে পরে সাত ফেচাঙ তুলবেক।

—ওরে শালা, ছোট্। ছোট্ বলছি। গিয়ে ফিরায়ে নিয়ে আয়। বলবি, সর্দারের হুকুম যে যাবেক তাকে আর ঢুকতে দিব নাই ছত্রিশ জাতিয়ার গড়ে। সে অর্জুনকেও না। যা শালা, যা।

গণ্ডার ছুটল সঙ্গে সঙ্গে।

অহল্যা বললে, তা যাক ক্যানে গিয়েছে। পুজো বলে কথা, তার ওপর ছেলে ছোকরা বয়েস—

—অহল্যা, অহল্যা তোর মুখটা ভেঙে দোব। চুপ করবি?

বলেই দলু হনহন করে গিয়ে তাদের সেই বড় নাকাড়াতে ঘা মারতে লাগল। ডুম—ডুম—ডুম ডুম ডুম ডুম।

সারা বারো পাহাড়ের গায়ে ধ্বনিটা প্রতিহত হয়ে একটা ধ্বনি বারোটা হয়ে বেজে উঠল।

প্রতিটি পাইক বাড়ি থেকে মেয়েরা উঠোনে নেমে তাকালে এই দিকে। পাইকরা যে যা করছিল, ফেলে রেখে বেরিয়ে পড়ল।

ভৈরব হনহন করে সর্বাগ্রে ছুটে এসে দলুর কাছে দাঁড়াল।

—সর্দার!

—ভৈরব, তু যারে, তু যা। গণ্ডারের কথা তো সি মানবেক নাই, তু যা। ফিরায়ে আন্ ঘাড়ে ধরে, তাকে ফিরায়ে আন্। সি দত্যিটা গেল শঙ্করীপুরে অষ্টমীর রাতে খেল জিততে।

তু যা, শঙ্করীপুরের জমিদার এখন চন্দনগড়ের তাঁবে। সেখানে চন্দনগড়ের মরদরা আসে। তু যা।

—কি বাপ? গোলমাল নাকাড়া শুনে বেরিয়ে এসেছিল রুক্মিণী—সে জিজ্ঞাসা করলে, কি বাপ?

—অর্জুন! মা, অর্জুন চলে গেল শঙ্করীপুর অষ্টমীর রাতের খেল জিততে।

রুক্মিণী বললে, যাক বাবা যাক। তার অদৃষ্ট তাকে যেখানে নিয়ে যায় যাক। তার অদৃষ্টে যা থাকে থাক। সে যাক। তোমাকে যা বললাম তুমি তাই কর। সব সাজতে বল। না হয়—আমি এবার চিতা জ্বালিয়ে তার উপর চড়ে বসব। চলে যাব আমার রাজার কাছে। তার চোখ দুটো যেন জ্বলছিল।

ছয়

প্রতিবাদ করতে সাহস করলে না শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে গেল দলু সর্দার। সেই ভাল। সেই ভাল। অর্জুন সিং, কুমর সাহেব, তোমার নসীব তোমার হাতে। আপসোস! এমন মাতাজীকে তুমি চিনলে না। নিজের পরিচয় তুমি জানলে না। তোমার নসীব—আর কিষণজীর খেল! তাঁর ইচ্ছা—তাঁর ইচ্ছা যে দিন হবে—সেদিন তুমি জানবে নিজেকে। কিন্তু তার জন্যে দলু সর্দার আর অপেক্ষা করবে না। করবার তার উপায় নেই। মাতাজী তার বেটি রুক্মিণী—রাণী মাতাজীর হুকুম হয়ে গিয়েছে। তার থমথমে মুখ দেখে ভয় করছে দলুর।

* * * *

এতকাল পরে, অর্জুনকে না নিয়েই লড়াইয়ের উদ্যোগ করতে দলুর মনে হচ্ছে অর্জুনের কথা। রাজা মাধব সিংএর ছেলে। সে হয়ে গেল মূর্খ, গোঁয়ার, বুদ্ধিহীন। হায়রে হায়!

দলু বেশ জানে—গণ্ডার গিয়েও অর্জুনকে ফেরাতে পারবে না। সে ফিরবে না, ফিরবার ছেলে সে নয়।

সে কারুর হুকুমে আমোদ ছেড়ে ফিরবে না। বাল্যকাল থেকে সে সবল স্বাস্থ্যবান। একবার তার ওই জ্বর আমাশয় হয়েছিল। দলুর উদ্বেগের সীমা ছিল না। রুক্মিণী মাথার শিয়রে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। দলু ওষুধ দিয়েছিল, মাত্রা ছাড়িয়ে বেশিই দিয়েছিল। অসুখ সারতে দেরি হয় নি। কিন্তু তখন থেকেই তার মেজাজের উগ্রতা বেড়ে প্রায় তাকে পাগলই করে তুলেছিল। তার উপর দলুরই সমাদর। সমাদরের সীমা-পরিসীমা ছিল না। দলু মদ খেতো, সেও বলত আমি খাব। দলু তাই দিত। পনের ষোল বছর থেকে সে মাতাল। পাখি শিকার করত বাল্যকালে। চোদ্দ বছর বয়সে হরিণ মেরেছে, বরা মেরেছে। ষোল বছরে প্রথম মারে চিতা বাঘ। তারপর ডোরা বাঘ মেরেছে। বনে বনে উল্লাস এবং দুর্দান্তপনা করে বেড়িয়েছে ইচ্ছামত। তার নিজের দল একটা গড়ে নিয়েছে সে। গড়তে হয় নি, আপনি গড়েছে। গণ্ডারের বয়স প্রায় তিরিশ। ওদিকে

তিরিশ, নিচের দিকে ষোল পর্যন্ত নিয়ে পঁচিশ জোয়ানের এক দল। সে জোয়ানেরা শহরের ষণ্ডা জোয়ান নয়, গ্রামের নওজোয়ান নয়, বনের বুনো জোয়ান। সকলেরই প্রায় এক একটি তরুণী প্রিয়া আছে। তাদের মধ্যে ছত্রিশ জাতিয়াদের বেটি আছে, আছে পাইকদের লুঠ করে আনা নানান শ্রেণীর মেয়েদের গর্ভজাত মেয়েরা। পাইকদের নিজেদের মেয়েরা বন্ধা হলেও বন্ধন আছে। নিয়মকানুন আছে। কড়া কানুন। কঠিন শাস্তি হয়। পুরুষেরা নিজেরা যা করুক মেয়ের অনাচার সহ্য করে না। বুনো মানুষ, লুণ্ঠক; ডাকাত বললে ডাকাতও বটে। আসল পেশা পাইকগিরি অর্থাৎ যুদ্ধবাজী। তারা নির্মম প্রহার করে অনাচারের ক্ষেত্রে। আঙুল দিয়ে দেখায় রুক্মিণীকে। বলে, দেখ্। রুক্মিণীকে মেয়েরা সত্যিই ভক্তি করে। শ্রদ্ধা করে। তবে গোপন অনাচার সব সমাজেই আছে, তা গোপনেই চলে। পুরুষদের এই সব লুঠে আনা মেয়েদের ও ছত্রিশ জাতিয়াদের মেয়েদের সঙ্গে উল্লাস রঙ্গরস প্রেম ব্যভিচার নিয়ে বাদপ্রতিবাদ করে না। দেশে ছত্রিরাজা থেকে বড় জোতদার, তালুকদার, সর্দার—ব্রাহ্মণ কায়স্থ থেকে সব শ্রেণী ও থেকে সমাজের মধ্যেই ওটার রেওয়াজ রয়েছে। লোকে কুকুর বিড়াল পোষে, ঘোড়া রাখে একটার জায়গায় দুটো তিনটে, বাজপাখি পোষে, ময়না পোষে; এও তাই প্রায়। সুতরাং তরুণ অর্জুনের দলের ছোকরা ও জোয়ানদের তরুণী প্রিয়া প্রকাশ্যেই ছিল। কিছুদিন পর ঘরেই নিয়ে আসবে। আবার বিয়েও করবে। এ মেয়েটাও প্রতিবাদ করবে না, পালাবে না; সমান হাসবে, ঘরের কাজকর্ম করবে; বাড়ির বউকে খাতিরও করবে আবার কখনও তার সঙ্গে কলহও করবে। কিন্তু প্রথম প্রথম এরা শুধু লীলাসঙ্গিনী। কৈশোর থেকে খেলা করতে করতে যৌবন শুরু হলেই জোড় বেঁধে বনে পালায়। নাচে, গায়, গল্প করে, গাছের উপর চড়ে—এ ওকে ধরতে যায় ও তাকে ধরতে যায়। মধুর চাক ভেঙে খায়। মদ খায়। খরগোশ পাখি শিকার করে পুড়িয়ে খায়। সারা দিনই হয়তো কেটে যায়। সন্ধ্যাতে ফেরে। কোথাও মেলাখেলা হলে তখন জোড় বেঁধে যায়। পাঁচটি দশটি জোড়ে দল বাঁধে। একসঙ্গে মেলা দেখে; প্রিয়ার মনের মত পুঁতির মালা, পায়ের ঘুঙুর, কাঁসার কাঁকনি, রূপদস্তার চুড়ি, রঙীন গামছা কিনে দেয়। অর্জুনের মত তাদের শাড়ি কিনে দেবার ক্ষমতা নেই। অর্জুন ঝুমঝুমিকে দুবার দুখানা শাড়ি কিনে দিয়েছে। তাঁতের মোটা শাড়ি। শুধু শাড়ি নয়, শাড়ির সঙ্গে উপরের অঙ্গে পরবার আঁচলা পর্যন্ত। ঝুমঝুমি কপালে একটা রূপোর টিকলি পরে। তার কপালটি ছোট, কালো কপালের উপর সাদা রূপোর চাঁদ ঝিক্‌মিক করে। অর্জুনের সঙ্গে কার সঙ্গ? সে দলু সর্দারের নাতি; ছোট সর্দার; হবু সর্দার। দলুর কাছে সে টাকা আদায় করে, তার অহল্যা দিদি দেয়। তা ছাড়া সে ধার করে। ভৈরব গোবর্ধন স্বরূপ ভূপাল চার সর্দার দলু সর্দারের পরেই, তারাও তাকে ধার দেয়। অর্জুন অবশ্য শোধ করে, দাদোর কাছে নিয়ে দেয়। তার নিজের রোজগারও আছে। সে মধুর চাক এনে মধু জমা করে, মধুর মেরে পালক পেখম সংগ্রহ করে, সজারুর কাঁটা জড়ো করে। তারপর দেয় ছত্রিশ জাতিয়াদের, তারা হাটে নিয়ে গিয়ে বেচে এনে টাকা দেয়। তারা নেয় সিকি, অর্জুন নেয় বারো আনা। অন্য সকলেও এসব করে। কিন্তু বনের যে এলাকাটা অর্জুনের সেটাই সবার

চেয়ে বড়। তাকে সর্দারি মাসুল দিতে হয় না। অন্যদের নিজের বন নেই। সাজার বনে তারা এ সব সংগ্রহ করে, তার সিকি দিয়ে আসতে হয় সর্দারকে। অর্জুনের নিজের এলাকা আছে, তার থেকেও সর্দারের সিকি দেবার নিয়মও বটে, কিন্তু অর্জুন সে দেয় না। প্রথম প্রথম দিয়ে একদিন বলেছিল, নেহি দেঙ্গা।

দলু বলেছিল, কি বিপদ! সর্দারি তো আমার নয় হে কত্তা। ই তো সরকারি তবিল। আমি নাড়িচাড়ি, এর সিকি আমার, কিন্তু বারো আনার মালিক তোমার মা।

অর্জুন বলেছিল, সে সব আমি নাহি জান্‌তা হ্যায়। নেহি মান্‌তা হ্যায়। দাদোও জানি না, মাও জানি না, সর্দারিও জানি না। নেহি দেঙ্গা। জোর করেঙ্গা তো এসো কার জোর বেশি দেখি।

মা বলেছিল, আমার হুকুমে সকলে মিলে তোকে ধরে বেঁধে সাজা দেবে।

—তাহলে হামি চলে যাঙ্গা। নেহি থাকেঙ্গা এখানে। চলে যাঙ্গা ঝুমঝুমিকে নিয়ে।

দলু হেসে বলেছিল, আচ্ছা আচ্ছা। তু যদি আমার সঙ্গে পাঞ্জাতে জিততে পারিস তবে তোকে লাগবে না। আয়। কার জোর বেশী দেখি বলবি তু, তা দেখি আয়।

—এসো।

তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়েছিল সে। কিন্তু অর্জুনের মা লড়তে দেয় নি। রুক্মিণী বলেছিল, না। এমন জোরে বলেছিল যে দলু এবং অর্জুন দুজনেই চমকে উঠেছিল।

দলু বলেছিল, মা!

রুক্মিণী বলেছিল, না।

অর্জুন বলেছিল, তবে হাম চলে যাঙ্গা। আমার টাকা চাই। ঝুমঝুমিকে কাপড় দোব গয়না দোব। দাদোর কাছে কত হাত পাতব? নেহি পারেঙ্গা। আমি মরদ। আমার সরম নাই!

দলু বলেছিল, আমি দোব।

—নেহি। নেহি লেঙ্গা।

অহল্যা বলেছিল, ওরে ধর্মের ষাঁড়, আমি দোব।

—না। না। না।

—ওরে, আমার ভাল ভাল শাড়ি আছে—

—পুরনো ঝুটা এঁটো। নেহি মাংতা। হাম কিনে দেঙ্গা।

রুক্মিণী বলেছিল, বাপ, আমার হুকুম, ওই বদমাস বেতমিজকে ধরে এই গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে দাও।

—অ্যা-ও। বলে জন্তুর মত চিৎকার করে উঠেছিল অর্জুন। একগাছা লাঠি ধরে সে লড়াইয়ের জন্য তৈয়ার হয়ে খাড়া হয়ে গিয়েছিল।

মা চিৎকার করেছিল, আমার হুকুম কি তামিল হবে না বাপ!

সেই মুহূর্তে ঘটেছিল একটি বিচিত্র ঘটনা। ঝুমঝুমি দাঁড়িয়েছিল গাছের আড়ালে। ছিপ-ছিপে পাতলা কালো মেয়ে। পরনে হাঁটু পর্যন্ত খাটো গামছার মত একখানা কাপড়, বুকে

একখানা রঙীন গামছা, হাতে শাঁখার চুড়ি দুগাছা কালো নিটোল হাতে ঝলমল করছিল। মাথায় একরাশ করকরে কোঁকড়া চুল এককালি ন্যাকড়া দিয়ে একটা খোঁপার মত বাঁধা। নাকে একটা রূপদস্তার কাঠি। সে গাছের আড়াল থেকে ছুটে এসে দাঁড়িয়েছিল অর্জুনের রুদ্রমূর্তির সামনে—আমাকে আগে মার তুমি, আমাকে আগে মার।

অর্জুন থমকে দাঁড়িয়েছিল। সে এক মুহূর্তের জন্যে, তারপর ক্রুদ্ধ গর্জনে বলেছিল, সরে যা।

—না।

—তবে তু মর্।

সে লাঠি তুলেছিল।

কিন্তু তাতেও ঝুমঝুমি সরে নি। বলেছিল, মার্ মার্। মরে যাই। মার্।

অর্জুন স্থির হয়ে গিয়েছিল। ঝুমঝুমি তখনও বলছিল, মার্ মার্।

অর্জুন লাঠি ধরেই দাঁড়িয়ে ছিল। রুক্মিণী আবার বলেছিল, লাঠি ফেল্ অর্জুন। তুই ওই ছত্রিশ জাতিয়ার মেয়েটার চেয়েও বর্বর।

অর্জুন লাঠিটা ফেলে দিয়েছিল। তারপর ঝুমঝুমির হাত ধরে বলেছিল, চল্, ইখান থেকে চলে যাব তুকে লিয়ে।

—না। ঝুমঝুমি তার হাত ছাড়িয়ে হাত জোড় করে রুক্মিণীকে বলেছিল, মা!

রুক্মিণী মন্দিরে ঢুকে দোর বন্ধ করেছিল। অর্জুন হনহন করে চলে গিয়েছিল বনের দিকে। দলু চমকে উঠেছিল—অর্জুন!

—আমি যেছি সর্দার, ফিরায়ে আনছি উকে। ডেকো নাই, রাগ না পড়লে তো উ ফিরবে নাই। বলেছিল ঝুমঝুমি এবং সেও ছুটেছিল।

বহু কষ্টে বুঝিয়ে ঝুমঝুমি যখন তাকে ফিরিয়ে এনেছিল তখন দলু সর্দার পাইক সর্দারদের নিয়ে বৈঠকে বসেছে। বেলা তখন অপরাহ্ণ। সকলের মাঝখানে মুখ নিচু করে বসে আছে রুক্মিণী। ঝুমঝুমির সঙ্গে অর্জুন এসে দাঁড়াল। চুপ করে দাঁড়াল। ঝুমঝুমি বললে, যাও যাও।

—না। ইরা সবাই থাকতে সি পারব না আমি। না।

সকলে আশ্চর্য হয়েছিল। কি বলছে অর্জুন!

ঝুমঝুমি বলেছিল দলুকে, সর্দার!

—কি?

—যেতে বল। ইদেরকে যেতে বল।

—ক্যানে?

সে কথা ঝুমঝুমিকে বলতে হয় নি, বলেছিল অর্জুন নিজে।—ক্যানে? আমি আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলব, সে কথা উরা শুনবেক ক্যানে? শুনবার কে? সর্দার! ভারী বুদ্ধি সর্দারের। আমি পায়ে পড়ব। সবারই ছামনে পড়তে হবেক নাকি হে?

সকলে উঠে চলে গিয়েছিল সেই মুহূর্তেই। দলুও যাচ্ছিল। কিন্তু অর্জুন বলেছিল, বুড়া, তু থাক। তু দাদো। তু যাবি কোথা? বস্।

বলেই সে এসে মায়ের পা দুটো চেপে ধরেছিল, মা!

ওই একটি কথাই বেরিয়েছিল। তারপর হো হো করে কান্নায় প্রায় ভেঙে পড়েছিল। অনেক কষ্টে শেষে বলেছিল, আমার নরক হবেক। আমার নরক হবেক।

এরপর মা আর থাকতে পারে নি। তার চোখ দিয়েও জল গড়িয়ে পড়েছিল। সে নিঃশব্দে তার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল।

—মা!

মা নির্বাক, পাথরের মত। অশ্রুর ধারা দুটি বারো পাহাড়ের ঝর্ণার ধারার মত ঝরছিল।

—মা গো! মা!

—অর্জুন!

—আমার পাপ হল মা। মাফ কর মা।

—করেছি অর্জুন।

দলু তার হাত ধরেছিল এবার—উঠ গে বাবু সাহেব, রাজাবাহাদুর উঠ।

অর্জুন উঠে দাদোর গলা জড়িয়ে ধরেছিল—তা লারব। দাদো, তোর চুমো খেছি দাদো, দাদো রে—

দলু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, চল হে পঞ্চায়েতের কাছে। তোমাকে বনের লেগে বছরে জননীকে আশ্বিন কিস্তি চৌত কিস্তি দু কিস্তিতে দু সিকা লাগবেক। বাস্। চল এখুন। পঞ্চায়েতে গিয়া বল, দোষটা তুমার হইছিল।

—হঁ। তা হইছিল। তা চল। বলব।

তারা দুজনে গিয়েছিল, কিন্তু ঝুমঝুমি ছিল রুক্মিণীর কাছে। হাত জোড় করে সে বলেছিল, মায়ী!

রুক্মিণী তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ঝুমঝুমি বলেছিল, মায়ী!

—কি বলছিস, বল্।

—মায়ী, তুমি উকে বুঝায়ো মা, বুকে জড়ায়ে রেখো। তা লইলে তো বাঁচবে না উ। পাহাড় থিকে ঝাঁপ খাবে। লইলে নিজের বুকে ছুরি বসাবেক। তুমি উকে বাঁচায়ো।

—কেন ঝুমঝুমি? ও যে মাপ চেয়ে গেল, কাঁদল।

—আরও কাঁদবে মায়ী, পাগল হবেক। আমি মলে—

—ঝুমঝুমি!

—তুমি কথা দাও মা। আমি নিশ্চিন্তি মরব।

—ঝুমঝুমি! না।

—আমার লেগে উ এমুন হইছে মা। তবে উ পাগল বটেক। আমার লেগে বেশি পাগল হল। আমি মরব রেতে। সাপের বিষ আছে বাবার শামুকের খোলায়। খেলেই মরে যাব। তুমি উকে—

—না না না। ঝুমঝুমি, না। ওরে না।

রুক্মিণী উঠে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। ঝুমঝুমি অনুভব করেছিল, রুক্মিণী থরথর

করে কাঁপছে।

ঝুমঝুমি বলেছিল, মায়ী!

—না ঝুমঝুমি, তুই মরিস নে। খবরদার রে, খবরদার। ওকে তোকে দিলাম রে। ও তোর। তুই শুধু—

—কি মায়ী?

—ওকে মদ ছাড়া। মানুষ কর্।

—সে কি আমি পারি মায়ী, তুমি পার না?

—পারতেই হবে তোকে। ওরে, তোরা জানিস না, ও আমার পেটের ছেলে হলেও ও রাজার ছেলে।

—মায়ী!

নিজেই চমকে উঠেছিল রুক্মিণী। এ কাকে সে কি বলছে! পরক্ষণেই বলেছিল, কিন্তু খবরদার ঝুমঝুমি, এ কথা কাকেও বলবি না। কাকেও না, ওকেও না। খবরদার, তা হলে তোর মুখ দেখব না।

—বলব না মায়ী।

রুক্মিণী সেদিন ওকে নিজের পুরনো কাপড় যা তোলা ছিল, তাই পরিয়ে নিজে কেশসজ্জা করে দিয়ে মাথায় নিজের ছেলেবয়সের রূপোর টিকলি পরিয়ে দিয়েছিল। তারপর অহল্যাকে ডেকে বলেছিল, পিসী, দেখ তো।

পিসী ঝুমঝুমিকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। সবিস্ময়ে বলেছিল, ঝুমঝুমি! অর্থাৎ এ কি সত্যই ঝুমঝুমি! রুক্মিণী সন্ধ্যার সূর্যের আলোতে ঝুমঝুমির চিবুক ধরে মুখখানি তুলে ধরেছিল। সেও মুগ্ধ হয়ে বলেছিল, হ্যাঁ।

—ই যি কালো রাধা লো রুক্মিণী!

—তাই বটে!

সত্যই অপরূপা লাগছিল কালো মেয়েটিকে। সুনিপুণ প্রসাধনে তার বন্য বর্বর রূপ পাল্টে গিয়ে দ্রুপদ রাজার স্বয়ম্বর সভায় কৃষ্ণবর্ণা কৃষ্ণার মত লাগছিল।

রুক্মিণীর পিসী অহল্যা তাড়াতাড়ি রুক্মিণীর ঘরের ভিতর থেকে আয়নাখানা এনে ঝুমঝুমির সামনে ধরে বলেছিল, নিজে দেখ্ লো একবার। ছত্রিশ জাতিয়া বেদেনী মোহিনী হয়ে গিয়েছিস।

অবাক হয়ে নিজেকে নিজে দেখছিল ঝুমঝুমি।

রুক্মিণী বলেছিল, আয় এবার। ঝুমঝুমির হাত ধরে সে তাকে কিষণজীর মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, শোন্। এই ঠাকুরকে সাক্ষী করে তোকে আমার বেটার সেবা করবার জন্যে নিলাম। তার সেবা করবি। বল্, ঠাকুরের সামনে বল্।

অবাকের উপর অবাক হয়েছিল ঝুমঝুমি। তাদের কতজনের কত পাইকের সঙ্গে প্রেম হয়, একদিন তারা মেয়েদের নিয়ে যায় নিজেদের ঘরে; কই, ঠাকুরের সামনে এমন করে বলতে হয় না, এমন করে সাজিয়ে দেয় না, সাজতে পায় না। কিন্তু এ কি হল তার! মাথার

ভিতর ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। কেমন ভয় লাগছে, বুকের ভিতরটায় যেন গুরু গুরু করে মেঘ ডাকছে।

—বল্‌—

—তার সেবা করব।

—বল্‌, তাকে ছাড়া অন্য পুরুষকে ভজব না। বল্‌।

—কখুনও না। কখুনও ভজব না মা। তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি।

বল্‌, তার মদ খাওয়া কমিয়ে তাকে মানুষ করবি। সে রাজার ছেলে, তাকে তাই করে দিবি?

ঝুমঝুমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, রাজার ছেলে কেমন সি তো জানি না মায়ী।

—বেশ, আমি যেমন মা, তেমনি মায়ের ছেলে করে দিবি।

—করব মা।

রুক্মিণী তারপর পিসীকে বলেছিল, পিসী, বাপকে ডাকতে বল্‌; ঝুমরীকে আর সর্দারদের।

সর্দাররাও এসে এই কালো মেয়েটির আশ্চর্য রূপ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। অর্জুন ছুটে এসেছিল ঝুমঝুমির কাছে। রুক্মিণী বলেছিল, এই উজবুক, থাম্‌।

অর্জুন অতদিন হলে থামত কি না সে ভগবান জানেন, কিন্তু সেদিন থেমেছিল। শুধু বলেছিল, তু সাজালি মা? তু?

—বর্বর কোথাকার, তুমি বলতে হয়।

—আমার লাজ লাগে।

অহল্যা বলেছিল, ঝুমঝুমির হাত ধরতে ছুটে আসতে লাজ লাগে না বেহায়া?

—হুঁ। আজ লাগছে।

সকলে হো হো করে হেসে উঠেছিল। অর্জুন আরও লজ্জা পেয়েছিল। রুক্মিণী বলেছিল, বাপ!

—মা!

—তোমাকে, সর্দারদিকে সাক্ষী করে ঝুমঝুমিকে আজ থেকে অর্জুনের দাসী করে দিলাম। শুধু তোমরা নও, কিষণজী সাক্ষী রইলেন। আজ থেকে দিনরাত্রি ও অর্জুনের ঘরে থাকবে। অর্জুনকে বলতে হবে, কখনও সে ঝুমঝুমিকে ছাড়বে না বিনা দোষে। তার অপমান করবে না, অন্য মরদকে তার গা ছুঁতে দেবে না। বল্‌ অর্জুন, কিষণজীর সামনে বল্‌। আয়, বল্‌।

অর্জুন অবাক হয়েই বলে গিয়েছিল যাকাগুলি। সেও এমন করে কথা কখনও বলে নি।

* * * *

সেদিন থেকে ঝুমঝুমি অর্জুন একসঙ্গে থাকে। ঝুমঝুমি তার রাখনী। কিন্তু অন্যদের রাখনার মত নয়। একটু আলাদা। এবং সেবাও তার আশ্চর্য। এই মাস কয়েক আগে

বর্গীরা যখন মেদিনীপুরে ঢোকে তখন গাছে চড়ে লুকিয়ে দেখতে গিয়ে কিসের কামড় খেয়ে যাতনার জ্বালায় অস্থির হয়ে সে নদীর জলে ঝাঁপ খেয়েছিল। ঝুমঝুমি তার সঙ্গে ছিল। ঝুমঝুমিকে নিয়ে সে মাস কয়েক বলতে গেলে প্রমত্ত জীবন যাপন করেছে। দিনরাত্রি বনে বনে ঘুরেছে। সে বাঁশী বাজিয়েছে, ঝুমঝুমি নেচেছে। সে মদ আরও বেশী খেয়েছে, ঝুমঝুমিকেও খাইয়েছে। ঝুমঝুমি যে কথা রুক্মিণীকে দিয়েছিল তা সে রাখতে পারে নি। তার সাধ্য ছিল না। হয়তো এতে তার সাধও ছিল। তার ছত্রিশজাতিরা বেদিয়া জীবনের এমনিই ছিল ছেলেবেলা থেকে সাধ। সে-সাধের বিরুদ্ধে সে যেতে পারে নি। রুক্মিণীর সাময়িক স্নেহ সব মুছে গিয়ে ঘৃণায় পরিণত হয়েছিল। নিজেকেই দোষ দিয়েছিল সে। তার এমন প্রত্যাশা করাই ভুল হয়েছিল। মেয়েটা যে ছত্রিশজাতিয়া বেদেনি। কিন্তু সেবার ক্ষেত্রে ঝুমঝুমি তার কথা রেখেছিল। সে যে কি কষ্টে তাকে বাড়ি এনেছিল সে কেউ কল্পনা করতে পারে না। এমন দশাসই জোয়ান অর্জুন, তাকে ওই কৃশাঙ্গী মেয়েটা কেমন করে বয়ে আনলে ঘরে। তারপর সর্বাঙ্গ ফুলে উঠল অর্জুনের। ঝুমঝুমির বাপ বেদে। সাপের ওস্তাদ, বিষের ওঝা চিকিৎসক। সে করলে চিকিৎসা। রুক্মিণী মাথার শিয়রে বসে থাকত। আর এই মেয়েটা নিদ্রা নেই আহার নেই সেবা করেছে। অর্জুনের শরীরে চাকাচাকা মত হয়েছিল। দুর্গন্ধ রস গড়াত। মেয়েটা শিমুল তুলো ভিজিয়ে মুছত। ময়ূরের পালকে ওষুধ ভিজিয়ে লাগাত ক্ষতে।

মীর হবিব বর্গী নিয়ে এলেন, নবাবের তাড়ায় শেয়ালের মত পালালে। অর্জুন গাছে চড়ে বর্গী দেখতে গিয়ে কিসের কামড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল দু মাস। রুক্মিণী তখন কিষণজীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলত, তুমি ওকে নিলে না কেন? ওকে যদি নিতে, ও যদি মরত তা হলে যে বর্গীদের ওই পালানোর সময়েই রুক্মিণী যেমন পারত মীর হবিবের রক্ত নিতে জান নিতে চেষ্টা করে মরত। এমন কথা দলু মন্দিরের বাইরে বসে শুনত আর চোখের জল ফেলত।

অর্জুন সেরে উঠে আবার যে অর্জুন সেই অর্জুন হয়ে উঠল।

রুক্মিণী একদিন বলেছিল, এতেও তোর শিক্ষা হল না?

হেসে অর্জুন বলেছিল, শিক্ষা? কিসের শিক্ষা? একদিন ভাত খেয়ে জ্বর হয়েছে বলে ভাত খাবে না লোকে? ভাত তো বারো মাস খায় লোকে। হুঃ! যত সব!

রুক্মিণী আর কিছু বলে নি।

মাস দেড়েক আগে একবার ক্ষেপেছিল মনসার মেলা যাবে। মনসা মায়ের মন্দিরে মেলা। যেতে দেয় নি রুক্মিণী।

এবার অষ্টমীর খেলা। বিজয়া দশমীর মাতনে সেই জন্যে কাউকে না বলে তার দল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তার সাঙ্গোপাঙ্গ চেলা চামুণ্ডের দল শুধু তার মোহগ্রস্তই নয়, তাদের স্বাস্থ্য আছে, শক্তি আছে, উল্লাসের তৃষ্ণা আছে; সাহস আছে দুর্দান্ত। তারাও বেরিয়ে গিয়েছে তাদের নবীন বয়সের সঙ্গী নবীন সর্দারের সঙ্গে। তার উপর সঙ্গে আছে আপন আপন সঙ্গিনী, তারাও প্রমত্তা। তারা ফিরবে না দলু জানে।

সাত

শঙ্করীপুরের মা শঙ্করী সাক্ষাৎ শঙ্করী। সাক্ষাৎ দুর্গা চণ্ডী চামুণ্ডা। প্রশস্ত বাঁধানো চত্বরের মধ্যে পাথরের গাঁথনি। দেওয়ালের উপর চাদ, একতলা ঘর, তার মধ্যে মা চণ্ডীর আটন। আগে ছিলেন গাছতলায়। গাছটা মরে গেছে কিন্তু শুকনো গুঁড়িটা এখনও আছে, তারই কোলে শিলামূর্তি। শিলার সর্বাঙ্গ সিন্দূর-লেপা, শুধু সোনার বা পিতলের দুটো গোল চোখ ঝক্‌ঝক্ করে।

বহুকাল থেকে এখানে আশ্বিনের পূজার সময় পূজা হয়; পূজা অষ্টমী নবমী দুদিন। তারপর দশমীর দিন ও অঞ্চলের লোক ঝেঁটিয়ে এসে জড়ো হয়, ভদ্রলোকে মাকে প্রণাম করে। হাতে অপরাজিতার লতা বাঁধে। কোলাকুলি করে। আর পাইক চুয়াড়রা এসে মদ খেয়ে গান করে, নাচে। সে এক হুল্লোড়।

অষ্টমীর দিন রাত্রে বলি হয় অষ্টমীর ক্ষণে। সেদিন পূজোর পর সব বড় বড় ওস্তাদ খেলোয়াড় আসে। লাঠিতে তলোয়ারে সড়কিতে তীর ধনুকে শঙ্করী মায়ের সিঁদুর লাগায়। আর একটা খেলা হয়। সে খেলার বিচার করে শঙ্করীপুরের ছত্রী নায়ক। খেলা দু ভাগে হয়। একটাতে খেলে শুধু ছত্রিরা, অন্যটাতে অন্য সকলে।

শঙ্করীপুরের অষ্টমীর দিন খেলায় যারা সকলকে হারায় তারা শির প্রসাদ পায় এবং তারাই হয় এ বছরের জন্য সেরা জোয়ান। বহুদিন থেকে অর্জুনের সাথ, তারা একবার গিয়ে এই প্রসাদ জিতে আনে। শির প্রসাদ হল এক একটা পাঁঠার মুণ্ডু, ওরা বলে 'মুড়ি'। অষ্টমীতে বলি হয় পঞ্চাশ ষাট। তার মুণ্ডগুলো সারি সারি সাজানো থাকে মন্দিরের মেঝেতে। প্রতি মুণ্ডুর উপর জ্বালা থাকে এক একটি মাটির প্রদীপ। খেলা শেষ হলে লাঠি তলোয়ার সড়কি তীর ধনুক আর কুস্তির সেরা খেলোয়াড়কে এক একটা করে মুড়ি প্রসাদ দেন পুরোহিত। ছত্রিরা আলাদা পায়, পাইকেরা আলাদা পায়।

* * * *

এ অঞ্চলের মধ্যে চন্দনগড়ের খেলোয়াড় ছত্রি এবং পাইক দুয়েদেরই খুব নামডাক। তারাই বলতে গেলে প্রতি বছরই শির প্রসাদ লুটে নিয়ে যায়। দু'চারটে মুড়ি অন্যেরা পায়। এলাকাটাও বলতে গেলে চন্দনগড়ের এলাকা। চন্দনগড়ের রাজা সুচেত সিং-এর পড়তাও খুব, প্রতাপও খুব। সুচেত সিং আগে বর্গীদের দোস্ত ছিল। উড়িষ্যার কাছে এই অঞ্চলটায় বর্গীদের প্রতাপই বেশি। নবাবের রাজত্ব মাসে দশ দিন থাকে, বিশ দিন থাকে না। কাজেই সুচেত সিং-এর প্রতাপ বড়, বাড়ন্তও খুব। এখানকার ছত্রি নায়ক চন্দনগড়ের অধীন নয়, সে শঙ্করী মায়ের দেবোত্তরের সেবায়েত। তার উপর হাত কেউ দেয় না। এলাকাটিও ছোট। শঙ্করীপুর মৌজাই এলাকা। গ্রামে বাসিন্দাও বেশি নয়। ঘর পঞ্চাশেক। পূজক ব্রাহ্মণ আছে কয়েক ঘর, ছত্রি ঘর বিশেক। বাকি সব কয়েক ঘর সদ্‌গোপ আর বাগ্দী চুয়াড়। আর ঘর চারেক বাস্তকর।

সদ্‌গোপেরাও দেবতার কাজ করে জমি ভোগ করে। দেবতার কাজেই জমি সব বেঁটে দেওয়া আছে। কেউ ফুল যোগায়, কেউ বেলপাতা, কেউ আতপ, কেউ গুড় চিনি, কেউ পাঁঠা। নিত্য বলি আছে। কেউ পাঁঠা বলি করে, কেউ ধরে, কেউ পাঁঠা বাঁধবার দড়ি দেয়। কেউ খর্পরের জন্য মাটির খুরি দেয়, কেউ ঘট। কেউ মন্দির ঝাঁট দেয়। কেউ বহুদূর থেকে ভারে বয়ে গঙ্গাজল আনে। এমনি ব্যবস্থা। গ্রামে ধনী কেউ নেই। তার উপর জাগ্রত দেবস্থান। ছত্রিরাও এখানকার রাজায় রাজায় যুদ্ধে দাঙ্গায় কারুর পক্ষ নেয় না। এখানকার ছত্রিদের খেতাবই হল—মায়ের দেওয়ান। কিন্তু অধীন কারুর না হলেও যে রাজার যখন বাড়বাড়ন্ত হয় তখনই তার প্রতাপের প্রভাব এসে পড়ে। চন্দনগড়ের প্রভাব এখানে অনেক দিনের। সুচেত সিং-এরও আগের আমলের। তাদের পুজো বছরে অনেকবার আসে। এবং তাদের পূজাই দেওয়ানদের পূজোর পর প্রথম। রাজা সেনাপতি সিপাহীরা সব দল বেঁধে আসে। রাণীরাও আসেন ডুলি করে। তখন কাপড়ের খের পড়ে। অন্য কেউ মন্দিরে ঢুকতেও পায় না। তারপর খেলা আরম্ভ হয়। মহাষ্টমীর রাত্রে—এ খেলা বীরের খেলা। তলোয়ার খেলা, সড়কী লাঠির খেলা, ধনুর্বাণের খেলা,—নামেই খেলা—আসলে সে যুদ্ধ। জখম প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে—মধ্যে মধ্যে খুনও হয়ে যায়। আঘাত তো খেলার আঘাত নয়। যুদ্ধের আঘাত। বিশেষ করে তলোয়ার খেলায় মধ্যে মধ্যে তলোয়ার আমূল বসে যায় বুকে কিংবা আঘাতে হাত মুণ্ড দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।

চারি দিকে মশাল জ্বলে, রাত্রির অন্ধকার উপরে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে, চারি পাশে স্তব্ধ জনতা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে, মধ্যে মধ্যে আপন অজ্ঞাতসারেই মুখভঙ্গি করে হাত পা নিয়ে আস্ফালন করে। খেলা শেষ হলেই অর্থাৎ একজন পরাজিত হলেই ধ্বনি ওঠে, রাত্রের আকাশের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে ছড়িয়ে পড়ে শূন্যলোকে। একজন ধরাশায়ী হতেই আর একজন লাফ দিয়ে পড়ে, বিজয়ীকে যুদ্ধে আহ্বান করে বলে, এস।

মন্দিরের দাওয়ায় বসে থাকেন বিচারকমণ্ডলী, তাদের পাশে থাকে অস্ত্রধারী সিপাহী। একালে তাদের হাতে বন্দুকও থাকে। এই প্রতিযোগিতায় যুদ্ধের নিয়ম কেউ লঙ্ঘন করলে তারা এগিয়ে এসে মাঝখানে দাঁড়ায়। প্রয়োজন হলে বন্দুকও ব্যবহার করে। এদের অধিকাংশেরাই চন্দনগড়ের। এখানকার ছত্রিরাজা মা চণ্ডিকার দেওয়ান সাহেব নামে প্রধান বিচারক হলেও চন্দনগড়ের রাজা সুচেত সিংই সর্বোচ্চ আদালত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এবার চন্দনগড়ের কেউই আসে নি। রাজা না, সেনাপতি না, কোন সিপাহীও না। এমন কি সাধারণ বাসিন্দাদের মধ্যে থেকে যে সব জোয়ানেরা এসে খেলায় বেশী মাতে তারাও না। এমন কি এখানকার ছত্রি রাজা মায়ের দেওয়ান তিনিও হাজির নেই। মহাষ্টমীর রাত্রেও এবার মা চণ্ডীর স্থানটায় যেন জমজমাট নেই। স্থানীয় লোকেরা আছে কিন্তু সে হৈ হৈ জমজমা গমগমা যেন ছাই-ঢাকা-পড়া আগুনের স্তূপের মত মনে হচ্ছে।

অর্জুনের দল এসে জয়ধ্বনি দিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকল—জয়, মা চণ্ডীর জয়।

তাদের দেখে লোকজনেরা চকিত হয়ে একবার তাকালে মাত্র। কিন্তু তারপর আপন কথায় মত্ত হয়ে গেল।

কথা আর কিছু নয়। 'বর্গী'। তাই বর্গী শব্দটাই কানে আসছে বার বার। অর্জুনেরা প্রণাম করে উঠে একটা ফাঁকা দেখে জায়গায় আসর পেতে বসল। অর্জুন বললে, ধুৎ তেরি। বর্গী—বর্গী—আর বর্গী। বর্গী কত দূরে ঠিক নাই, সব ভয়ে মরে গেল আগে থেকে। শালা! লোক কই রে? লড়ব কার সঙ্গে?

গণ্ডার বললে, বললাম তোমাকে ছোট সর্দার ফিরে চল। বড় সর্দার বারণ করেছে, মা বারণ করেছে, আমি নিজে বর্গীর খবর নিয়ে আইচি সেই বালেশ্বরের ধার থেকেন—তা তুমি শুনলা না। বললা ভাগ্ শালা। বালেশ্বরের আগে বর্গী তা তারা কি উড়ে আসবেক না কি? বর্গী এলে লড়াই হবে—সি যখন হবেক তখন হবেক। এখন আমোদ হবে নাই? মহাষ্টমী বন্ধ থাকবেক? শালারা মায়ের ওপর ভরসা করতে লারিস তো পূজোতে কাজ কি?

অর্জুন বললে—সি তো এখুনও বলছি রে। মায়ের পূজা করবি। মা আজ পাঁঠা খেলে ভোগ খেলে ঘরে এল, আজও বর্গীকে ভয়? ধুরো শালাদের পূজো! আর ধুরো শালারা অবিশ্বাসী! ভাগ!

ওদিকে ঢাক আর ঢোলে কাটি পড়ল।

প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে।

অর্জুন বললে মদ দে রে ঝুমঝুমি। লে রে, সব তৈরী হয়ে লে। চল্, এ 'কয়ো' কেটে আমোদ তাই হোক। ইবারে 'কয়ো' কেটেই আমোদ হোক।—অর্থাৎ কাক কেটেই আমোদ হোক।

বলে উঠে তাদের ধ্বনি দিয়ে উঠল—আবা-আবা-আবা-আবা জয়, মা চণ্ডী কি জয়!

* * * *

সত্যি এবার খেলাটা জমলই না। ছত্রিদের আসরে যারা খেললে তাদের খেলা দেখে অর্জুন হেসেই সারা হয়েছিল।—এই ছত্রিদের খেলা! ধু-রো! এক বুড়ো ছত্রি হরিহর সিং তলোয়ার সড়কি খেললে বটে। ভাল খেলা।

ছত্রিদের আসরে সে খেলে নি। সে পাইক বাগ্দীদের আসরে খেলেছিল। কিন্তু একটা কাণ্ড হয়েছিল। বুড়ো পুরোহিত; পাকা চুল, পাকা দাড়ি গোঁফ, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, গলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। হাতে তামার তাগায় রুদ্রাক্ষ। আচ্ছা মানুষ! তিনি এখানকার লোক নন; অনেক দূর থেকে আসেন এই পূজোর সময় আর কার্তিকের অমাবস্যায় কালীপূজোর সময়। খেলার আসরে নামবার আগে মাকে পুরোহিতকে প্রণাম করে আশীর্বাদী নিয়ে আসরে নামে—এই নিয়ম। সেই নিয়মবশে মালসাট মেরে লাঠি হাতে অর্জুন গিয়ে প্রণাম করে হাত পেতে দাঁড়াতেই তিনি যেন চমকে উঠেছিলেন।

চমকের সুরেই বলেছিলেন, তুমি!

—আজ্ঞে আমি খেলব।

—তুমি এদের সঙ্গে খেলবে কেন? তুমি ছত্রিদের সঙ্গে—তুমি ছত্রি নও?

—আজ্ঞে না।

—নও?

—না।

—বাগ্দী ?

—না। আজ্ঞে উ সব খবর আমি রাখি না। দেন, ফুল দেন, খেলি গা।

তিনি তার হাতে ফুল দিয়েছিলেন। লাঠি, তলোয়ার, সড়কি তিনটেতে সে জিতেছিল। তীর ধনুকে একটুর জন্যে হয় নি। তাও দুজনের সমান হয়েছিল। কুস্তিতে গণ্ডার জিতেছিল। শির প্রসাদ নেবার সময় পুরোহিত আবার তাকে বেশ করে দেখেছিলেন মশালের আলোয়। দেখে বলেছিলেন, তোমার নাম কি ?

—অর্জুন।

—অর্জুন কি ?

—সিং।

—তবে বললে যে ছত্রি নও ?

—না, আমি ছত্রি নই। উ মাশায় আমি জানি না।

—জান না ? বাবার নাম—

—সে সব জানি না, বাবা মরে গিয়েছে আমার জনমের ক মাস আগে। তা সি সব কথা আমাকে কেউ বলে না। আমি জানি না।

—এটি ? এটি কে তোমার ?

অর্জুনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল ঝুমঝুমি।

—উটো আমারই বটেক।

—বউ ?

—তা বটে বইকি।

—হুঁ।

বলে তিনি তাকে চারটি পাঁঠার মুড়ি দিয়ে বলেছিলেন, দাঁড়াও।

মন্দিরের ভিতর থেকে দুগাছি অপরাজিতার মালা এনে একগাছি দিয়েছিলেন অর্জুনকে, অন্য গাছি ঝুমঝুমিকে। আরও বলেছিলেন, তুমি যেয়ো না। সব হয়ে গেলে আমার সঙ্গে দেখা করো। নির্জনে।

—আজ্ঞে মদ খাব গা যি।

—মদ আমি দেব। মায়ের প্রসাদী মদ। বস।

সব হয়ে গেলে মন্দিরপ্রাঙ্গণে পুরোহিত অর্জুন আর ঝুমঝুমিকে ডেকে প্রসাদী মদ এবং মাংস প্রসাদ তাদের হাতে দিয়ে বলেছিলেন, খাও।

অর্জুন খানিকটা খেয়ে তাকিয়েছিল ঝুমঝুমির দিকে। ঝুমঝুমি লজ্জা পেয়েছিল, সলজ্জভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে বলেছিল, না।

অর্জুন হেসে বলেছিল, আপনাকে লাজ করছেক।

ঠাকুর বিচিত্র একটু স্নেহের হাসি হেসে বলেছিলেন, খাও মা, মায়ের প্রসাদ। খাও। তুমি তো নায়িকা মা। সাক্ষাৎ নায়িকা। তুমি খাবে না তো খাবে কে ? তবে মা, কখনও

কদাচারের অন্নে খেয়ো না। যখনই খাবে, মা খাও—বলে মনে মনে ডেকে খাবে। না হলে নিজেও ধ্বংস হবে, একেও ধ্বংস করবে।

দুজনেই ওরা থরথর করে কেঁপে উঠল। অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়েছিল ঠাকুরের।

ঝুমঝুমি বলে উঠেছিল একটু পর, বাবাঠাকুর!

—আগে খাও। প্রসাদ নাও।

ঝুমঝুমি মদের পাত্র শেষ করে কপালে ঠেকাল। ঠাকুর বলেছিল, এই তো।

অর্জুনের অস্বস্তি লাগছিল। সে বললে, এইবারে আমরা যাই বাবা? সঙ্গীরা সব বসে রইছে।

—তুমি বড় অস্থির। নিজের কাছ থেকে ছুটে পালানো যায় না। স্থির হয়ে দাঁড়াও। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। সত্যি বলবে?

ভয় পেয়েছিল অর্জুন। অন্ধকারের মূলে যে ভয় আছে সেই ভয়। সে সভয়ে বলেছিল, আজ্ঞে?

—তোমার মা বেঁচে আছে? রুক্মিণী?

চমকে উঠেছিল অর্জুন। আজ্ঞে! তাকে জান আপুনি?

—আগে বল বেঁচে আছে?

—আছে।

—সে—না, শুক্লীরা সাঙা করে না। সে কি নিয়ে আছে? কি করে?

—দিন রাত্রির কিষণজী আছে তার, তাই নিয়ে থাকে।

—দলু বেঁচে আছে?

—আছে।

—তবে তুমি কেন বললে, তুমি ছত্রি নও? কেন মিথ্যে বললে দেবতার কাছে?

—আজ্ঞে আমি জানি না। কেউ আমাকে বলে নাই। মা বলে মাতাল, পেটের কলঙ্ক—

—তুমি ছত্রি। তুমি রাজপুত। তুমি রাজার ছেলে।

চমকে উঠেছিল অর্জুন। তার দেহের মধ্যে রক্ত যেন শন শন করে ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছিল। কান দুটো গরম হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল। তার ইচ্ছা হয়েছিল সে চিৎকার করে ওঠে। উঠেওছিল। চাপা চিৎকারে সবিস্ময়ে সভয়ে প্রশ্ন করেছিল, ঠা-কু-র!

—চুপ কর। বুঝতে পারছি তুমি জান না, তুমি—

—বাবাঠাকুর! ঝুমঝুমি হাত জোড় করে সভয়ে বলেছিল, বাবা, ওর মা দেবতা, তিনি বলতে বারণ করেছে বাবা। উকে বল নাই। বাবা গো!

—থাক তা হলে, সে-ই বলবে। তবে শোন অর্জুন, আমি তোমার মায়ের গুরু। আমার বাবা ছিলেন তোমার বাবার গুরু। যার জন্যে তোমাকে ডেকেছি।

বলে তিনি আবার ঘরের মধ্যে গিয়ে একগাছা পৈতে ওই মায়ের অঙ্কের সিঁদুরে রাঙিয়ে এনে বলেছিলেন, মাথা পাত।

—কি?

—উপবীত। তুমি ছত্রি, তোমার উপবীত হয় নি—

—না।

—অর্জুন।

—না। আমার মা তো রাজার রাখনী ছিল—

—অ্যা—ই! গর্জে উঠেছিলেন ঠাকুর। তারপর বলেছিলেন, আমি নিজে তোমার মায়ের বিবাহ দিয়েছি। ও কথা উচ্চারণ করো না। মহাপাপ হবে।

এবার এগিয়ে এসেছিল অর্জুন। এসেও থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিল, ও?

আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল ঝুমঝুমিকে।

—ও তোমার সঙ্গে থাকবে। চিরদিন থাকবে। ও লক্ষ্মীবতী নায়িকা। ও অপরাজিতা। তারপর ঝুমঝুমির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, কি নাম মা তোমার?

—ঝুমঝুমি।

—তোমার নাম আমি দিলাম অপরাজিতা। কখনও এর অপমান করো না।

অর্জুন গলা পেতেছিল। ঠাকুর সেই রাঙা উপবীত তার গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, তুমি ছত্রি। তোমার বিবরণ তোমার মায়ের কাছে শুনবে। বলবে, তোমার গুরু শঙ্কর ভট্টাচার্য বলতে বলেছেন।

অর্জুন পৈতেটা পরে কেমন হয়ে গিয়েছিল। নেড়ে দেখেছিল। দেহ মন কেমন যেন অরোত্তাপে হয়ে উঠেছিল উত্তপ্ত, জর্জর। ঝুমঝুমি জিজ্ঞাসা করেছিল, ঠাকুর!

—ওকে কি নিয়ম পালতে হবে? খাওয়া-ছোঁওয়া—

—কিছু না। আমি বুঝতে পারছি যে অবস্থায় আছে তাতে মানা চলে না। মানতে হবে এই কটি নিয়ম। ছত্রি কখনও ভয়ে মাথা হেঁট করে না। ধর্ম ইজ্জত সব থেকে বড়। ধর্ম হল দেবতাকে প্রণাম করা, বিগ্রহ গো-ব্রাহ্মণকে রক্ষা করা, বিপন্নকে রক্ষা করা, কারুর উপর অত্যাচার না করা। ইজ্জত মর্যাদা হল ধর্মের আভরণ। দেশের স্বাধীনতা নিজের স্বাধীনতা হল মর্যাদা। নিজের স্ত্রীর সতীত্ব হল মর্যাদা। শুধু স্ত্রী নয়, নারী জাতি হল মর্যাদা। তাকে রক্ষা করবে প্রাণ দিয়ে।

অর্জুন ঠাকুরের পায়ে হাত দিতে গিয়ে থমকে গিয়েছিল। ঠাকুর বলেছিলেন, নাও, পায়ের ধুলো নাও।

—আমি? ঝুমঝুমি বলেছিল।

—নাও মা। তুমি নায়িকা। মহা পবিত্র তুমি।

ওরা প্রণাম করে চলে আসছিল। ঠাকুর বলেছিলেন, আর একটু দাঁড়াও।

—ঠাকুর!

—তোমাদের সৌভাগ্য—দুর্গা সিং নেই। চন্দনগড়ের কেউ আসে নি। এলে তোমাকে চিনতে বাকি থাকত না। তোমার রঙ ছাড়া মুখ চোখ নাক আকার অবয়ব সব তোমার বাবার মত। তোমরা বোধ হয় দলুকে রুক্মিণীকে লুকিয়ে এসেছ।

—হ্যাঁ বাবা। উ কিছুতে মানলেক নাই।

—মানবে না। হয়তো কালচক্র টানছে। তা তোমরা চলে যাবে?

যেন নিজেকেই প্রশ্ন করেছিলেন।

অর্জুন বলেছিল, না বাবাঠাকুর। দশমীর নাচন না নেচে যাব না।

—হ্যাঁ। দশমীর আশীর্বাদ নিয়ে গেলেই ভাল। তা শোন, এক কাজ কর। তোমরা একটু গা-ঢাকা দিয়ে থাক। সাবধানে থাকবে। কারুর সঙ্গে ঝগড়া করো না। বুঝলে? না মানলে বিপদ হবে। বুঝেছ, বিপদ হবে। কোথায় আছ?

—কোথায় আবার? গাছতলায়।

—আরও একটু সরে গিয়ে বনের ভিতর থাকো। অমান্য করো না, বিপদ হবে। আর দশমীর দিন যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করবে। সঙ্গীদেরও কাউকে কিছু বলবে না। কোন কথা না। তুমি ছত্রি তাও না। বুঝেছ। ঘরে ফিরে সর্বাগ্রে বলবে মাকে। মায়ের কাছে নিজের কথা শুনবে। তারপর সকলকে বলবে। মা অপরাজিতা, ও চঞ্চল, তুমি মনে রেখো। ও ভুলে গেলে তুমি এসো।

* * * *

বিজয়ার দিন সন্ধ্যাবেলা।

প্রচুর পরিমাণে মদ্য পান করে তারাও নেচেছে বলিদানের পর ওই দঙ্গলের সঙ্গে। সন্ধ্যায় ফিরে এল আস্তানায়। চণ্ডীতলা থেকে প্রায় আধ ক্রোশ দূরে ঘন বনের মধ্যে একটা ছোট ঝরনার ধারে তারা আড্ডা গেড়েছিল কদিন। জায়গাটায় গাছপালা একটু কম। সেইখানটা তারা কোদাল দিয়ে চেঁচেছুলে, গোবরজল দিয়ে নিকিয়ে নিয়ে বেশ ঝরঝরে করে নিয়েছিল। একদিকে রান্নার জায়গা। এখানে এসে চণ্ডীতলার মেলায় হাঁড়ি মালসা কয়েকটা খুরি-গেলাস কিনে রান্নাবান্না করেছে। শুধু ভাত আর মাংস। নবমীর দিন অষ্টমীর রাত্রে পাওয়া পাঁঠার মুড়ির মাংস খেয়েছে। তার উপর বনে ঢুকে একটা ছোট হরিণ মেরে এনেছিল। সেটাতেই চলেছে নবমীর রাত্রি, দশমীর দিনের বেলা; রাত্রির জন্যও রান্না করা মাংস হাঁড়ির গলায় দড়ি বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছে। আজ সন্ধ্যাবেলায় খাওয়াদাওয়া করে রওনা হবে রাত্রে। চণ্ডীতলার মা চণ্ডীর মূর্তি শিলামূর্তি। এখানে বিসর্জন নেই। ক্রোশখানেক দূরে মাটির প্রতিমায় পুজো হয়, এক মাহিষ্য জোতদারের ঘরে—ইচ্ছে সেই বিসর্জন দেখে রাত্রি দুপুর নাগাদ রওনা হবে তাদের বারোপাহাড়ী জঙ্গলগড়ের দিকে। পৌঁছে যাবে ভোর ভোর।

অর্জুনের স্ফূর্তি খুব। সে এবারকার আসরে শির খেলোয়াড়। এ দুদিন যখনই গিয়েছে চণ্ডীতলায় তখনই লোকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেছে—এই। এই। এই এবারকার শির খেলোয়াড়। বুকের উপর তার লাল পৈতে। পৈতেটা দেখে সঙ্গীরা বিস্মিত হয়েছে। প্রশ্ন করেছে। কিন্তু সে ঠাকুর মশায়ের বারণ মেনেছে, বলেছে শির খেলোয়াড়কে পৈতে দেয়।

স্ফূর্তিতে তার ইচ্ছে হত ডাক ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে শূন্যে মালকবাজী দেয়। কিংবা মাটির উপর বা হাতটায় ভর দিয়ে দেয় মালকবাজী। মায়ের পুষ্প এবং রঙীন গামছা সে মাথায় বেঁধেই রেখেছে কদিন। দেখুক, লোকে দেখুক। বাড়ি গিয়ে মাকে দাদোকে দেখিয়ে তবে খুলবে—তার আগে নয়।

অর্জুন বললে, লে, পাড়, হাঁড়ি পাড়। আর পাতা লে হাতে হাতে। মাংস আর মদ

খেয়ে লে। তারপর চল্ মাইতি বাড়িতে ড্যাং ড্যাং ড্যাং সো—ড্যানাক-ড্যানাক বাজতে লেগে গেয়েছে। চল্। শিগগির শিগগির সব সেরে লে।

গণ্ডার শুধু একপাশে মনমরা হয়ে বসে আছে।

অর্জুন বললে, কি রে গণ্ডারে, তোর হল কি ভ্যালা বল দিকি? ভাম ক্যানে রে শালো?

গণ্ডার এবার একটু নড়ে বসে বললে, তোমরা যাও ছোট সর্দার। আমি যাব নাই।

—যাবি নাই? ক্যানে রে? কার পীরিতে পড়লি রে মানিক? বল্, দেখায়ে দে। শালা—আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে কাঁধে তুলে তু দে ছুট। আমরা পিছাতে থেকে কথব। তার জন্যে মনখারাবি ক্যানে রে গাড়োল!

গণ্ডার এবার হাত মুখ নেড়ে বলে উঠল, পীরিত! তুমি বাবা ছোট সর্দার, তোমার সাত-খুন মাপ। তুমি যা খুশি করতে পার হে। তোমার সঙ্গে আমাদের সঙ্গ? পীরিত! বলে ভয়ে প্যাটের পিলাটা উপর বাগে মাথার উঠছেক। তোমাদের কিছু হবেক নাই। বিপদ আমার। বড় সর্দারের শাহী কিল, ভাদর মাসের তাল পিঠে পড়বেক আমার। হ্যাঁ, বলে কিলায়ে কাঁঠাল পাকায়ে দিবেক! বুঝেছ? আমি যাব নাই।

হো হো করে হেসে উঠল অর্জুন।

একজন প্রশ্ন করলে, যাবি না তো করবি কি?

—গলায় দড়ি দিব হে। নইলে চলে যাব যি দিকে দু চোখ যায়।

অর্জুন তখনও হাসছিল। গণ্ডার বললে, তোমার পায়ে ধরি ছোট সর্দার, এমন করে হেসো নাই বাপু। আমার বলে—

বেচারা কেঁদে ফেললে এবার হাউ হাউ করে।

এবার অর্জুন গম্ভীর হয়ে গেল। উঠে এসে হাত ধরে বললে, থাম গণ্ডার। আমি তুকে বাত দিছি হে—তুর কিল আমি পিঠ পেতে লিব। আর সর্দারের সঙ্গে বুঝা-পড়া করে লিব। না হয় তুদিকে নিয়ে চলেই যাব শালার জাগা ছেড়ে। লতুন গড় করব। মা কালীর দিব্যি, মা চণ্ডীর দিব্যি, কিষণজীর দিব্যি!

গণ্ডার মুহূর্তে হেসে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বললে, ছোট সর্দার, এই লেগেই তো তোমাকে এত ভালবাসি হে। তুমার লেগে জানটাও দিতে পারি।

অর্জুন বললে, লে, হাঁ কর্। আমি নিজে মদ ঢালব তুর মুখে। কোঁৎ কোঁৎ করে গেল্। লে।

খানিকটা মদ তার মুখে ঢেলে দিয়ে সে বসল, বললে, লে, ইবারে মাংস আন। দে গো—সব মাংস দে। ওই ছুঁড়িগুলান কুনো কম্মের লয় হে! এই ঝুমঝুমি! এই!

চারিদিক তাকিয়ে দেখলে অর্জুন। কই! ঝুমঝুমি কই!

—আরে! ঝুমঝুমি কুথা গেল হে?

মেয়েগুলি হাসতে লাগল।

—মরণ! হাসছিস ক্যানে?

একটা মেয়ে বললে, সি চণ্ডীতলা গেইছে কবচ আনতে। বুলে ঠাকুর বুলেছে তাকে

কবচ দিবেক। বশীকরণ কবচ।

খিলখিল করে হেসে উঠল সে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য মেয়েরাও। মুহূর্তে অর্জুনের মনে পড়ে গেল ঠাকুরের কথা।

'দশমীর দিন যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করো। সঙ্গীদের কাউকে কিছু বলবে না। ভুলো না।'

আট

শঙ্করীতলায় তখন অনেক লোকের ভিড়। অধীর স্বভাব অর্জুনের, সে খুব দ্রুতই চলেছিল মন্দিরের দিকে। নানান জনের নানা টুকরো কথা মিলে কলরব উঠেছে। বিজয়া দশমীর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। আকাশ নির্মেঘ। দশমীর চাঁদ পূর্ব দিকের আকাশে বড় তালগাছ-গুলোর মাথায় বিকেল থেকেই দেখা যাচ্ছিল। এখন আলোর দীপ্তিতে ঝলমল করছে। শঙ্করীতলা ফাঁকা জায়গা, জ্যোৎস্নার বেশ দেখা যাচ্ছে সব। এক জায়গায় সাঁওতাল মেয়েরা নাচছে। সাঁওতালেরা বাঁশী মাদল বাজাচ্ছিল। সে একবার থমকে না দাঁড়িয়ে পারলে না। বাবাঠাকুরের কাছে যাবার তাগিদ মনে থাকতেও দাঁড়াল। পিছন থেকে দু-তিন জনে ভিড়ের মাথার উপর ঝুঁকে পড়ল। খুব মদ খেয়েছে, গন্ধ পাচ্ছিল অর্জুন। একজন বললে, মেয়েগুলো বেশ রে। কালো হলে কি হবে—বাহারে কালো!

হাসি পেল অর্জুনের। ছোঁড়া নয় আধবয়সী। চাঁদের আলোয় ঝুঁকে-পড়া মাথার চুল দেখে বোঝা যায় চুল আধপাকা আধকাঁচা। কিন্তু রস আছে। রসিক বটে।

অন্য একজন বললে, দূর, উ কি বাহারে কালো। একটা কালো ছিপাছপে ছত্রিশ জাতিয়ার মেয়ে এসেছে দেখেছিস। শালা কোঁকড়া চুল। বাঁশের পাতার মত লম্বা চোখ, ছুরির মতন নাক, শালা দেখলে মাথা ঘুরে যায়।

মাথার ভিতরটা চন্ করে উঠল অর্জুনের। প্রথম জন বললে, দেখেছি। হাঁ হাঁ। গেল কোথা বল্ দেখি?

—সন্ধ্যের সময় তাদের দল বোধ হয় চলে গেল। বনের ধারে দেখেছি।

—শালা—তবে যাবে। হয়ে গেল।

—মানে?

—মানে, বনের ভেতর শোভান সাহেবের দল রয়েছে।

—আবদুস শোভান? কটকের?

—হ্যাঁ।

—কি করে জানলি?

রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল অর্জুন। লোকটি উত্তর দিলে, ওই বনেই তো আমাদের রক্ষা বাগ্দীরা কজনা মিলে রাহাজানি করে। তারা শোভানের দলের ভয়ে পালিয়ে এসেছেক। তারা

বলেছিল শোভানদের আজ একটা বড় লুট আছে। কি চন্দনগড়ের একটা ব্যাপার। ও মেয়ে বলছিস বনে ঢুকল—যাবে! তবে জানি না, শোভানের তাক চন্দনগড়ের ওপর। যদি জানাজানি না করে।

অর্জুন আর দাঁড়াল না। এসে মন্দিরের সামনে দাঁড়াল। দেখলে ঝুমঝুমি হাঁটু গেড়ে বসে অঞ্জলি পেতে আশীর্বাদী কিংবা মাদুলী নিচ্ছে। ঠাকুর তাকে দেখে বললেন, এসেছ? বড় চঞ্চল তুমি। বস, ঠিক সময়ে এসেছ। অপরাজিতা অঞ্জলি পেতেছে, ওর অঞ্জলি তুমি নিজের হাতে জোড় করে ধর।

ঠাকুর মনে মনে আশীর্বাদ করে ঝুমঝুমির হাতে দুটি তামার কবচ দিলেন। একটি চৌকো তক্তির মত, অন্যটি মাদুলী। বললেন, এই তক্তি তুমি গলায় কিংবা হাতে পরো। আর মা, তুমি এটি গলায় পরো। ধর্মকে মেনে চলো। মা তোমাদের বিজয় দেবেন। কিন্তু তোমরা কি রাত্রেই যাবে বনের পথে? না গেলেও বিপদ আছে। খবর পেলাম চন্দনগড়ের সুচেত সিং এখানে আসছেন দশমীর প্রসাদ নিতে। এসে পড়লেন বলে। দশমী তিথি একপ্রহর রাত্রি পর্যন্ত। তার আগেই আসবে সুচেত সিং। তার আর দেরি নেই। তোমাকে দেখলে—

চুপ করে গেলেন ঠাকুর। বললেন, বিপদ হবে তোমার। দাঁড়াও।

বলে তিনি চোখ বুজলেন। যেন ধ্যান। প্রায় মাথার উপর মন্দিরের বারান্দায় ষড়দলের মাথা থেকে একটা টিকটিকি টক্ টক্ শব্দ করে উঠল। ঠাকুর চোখ মেলে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন। তখনও শব্দটা হচ্ছে। তিনি এবার আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, মাথার উপর থেকে বলছে। যাও, চলে যাও। রাত্রেই চলে যাও। তোমরা জোয়ান-বীর, তুমি ছত্রি। শুধু মেয়েরা আছে সঙ্গে—

অর্জুন বললে, উদের হাতেও সড়কির মত হালকা খোঁচা আছে বাবা। আর বাঘনখীও আছে। দেখা ক্যানে রে ঝুমঝুমি।

ঝুমঝুমি নিজের পেট-আঁচল থেকে চুপ করে বের করলে বাঘনখ। এবং একটু হাসলে।

—ঠিক আছে, চলে যাও। জ্যোৎস্না কুড়ি দণ্ডের ওপর। প্রায় প্রহর রাত্রি পর্যন্ত। চলে যাও। মায়ের আদেশ হয়েছে, চলে যাও। কোন ভয় নেই। তিনি একটা শ্লোক বললেন।

দূরে মনে হল কোলাহল উঠছে। একটা কলরব ভেসে আসছে। ঠাকুর বললেন, বোধ হয় এসে পড়ল। চলে যাও। হাঁ, তোমার মাকে বলো চন্দনগড়ের খুব বিপদ। গতবার সুচেত সিং নবাবের পক্ষ নিয়ে কটকে সরন্দাজ খাঁর গর্দান নিয়েছিল। এক নাচনেওয়ালী নিয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া ছিল সরন্দাজ খাঁর। এবার সরন্দাজ খাঁর ছেলে বর্গীদের সঙ্গে জুটে দাবি করেছে চন্দনগড়ের দুই মেয়ে পাঠাতে হবে। মাধব সিং-এর বিধবা মেয়ে, আর সুচেত সিংএর নিজের মেয়ে। না দিলে চন্দনগড় তারা রাখবে না। বলো, তোমার মাকে বলো। আজ রাত্রের মধ্যে খবরটা মাকে দিলে ভাল হয়। কাল একাদশী সাইত্তের দিন। বলো, সব জেনে যা সংকল্প নেবার কালই যেন নেয়। বড় শুভদিন। আগের কালে এই দিনে রাজারা বিজয়া সেরে দেশ জয়ে বের হত।

মাধব সিং, চন্দনগড়, সুচেত সিং নামটা বহুবার সে শুনেছে। দাদো মা এই নাম নিয়ে গুজগুজ ফুসফুস করে। তাকে দেখলেই থেমে যায়। ভৈরব গোবর্ধনও করে। সে কোনদিন জিজ্ঞাসা কাউকে করে নি। আজ মনের মধ্যে নাম কটা ঘুরতে লাগল। মাধব সিং তার বাবা এটা সে জানে আর কিছু সে জানে না। সে ডান হাতে বুকের তক্তি, পৈতেটা নাড়ছিল অন্যমনস্কভাবে। ঝুমঝুমি তার সঙ্গে প্রায় ছুটে চলেছে। অর্জুনের পদক্ষেপ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর এবং দ্রুত হয়ে উঠেছে আপনা থেকে। একটা কিছু যেন আজ তার চারি পাশে তাকে ঘিরে থমথম করছে, ফিসফিস করছে। পথে শোভানের দল আছে। আবদুস শোভান। কটকের নাজিমি হারিয়ে নবাবের কাছে ভয়ে লজ্জায় ফিরতে পারে নি। বনে ডাকাত হয়েছে। আস্তানা তার উড়িষ্যায়। সে হঠাৎ চন্দনগড়ের বিপদের খবর পেয়ে বোধ হয় এ বনে ঢুকছে সুযোগমত হানা দেবে। শোভানের দল সিপাহীর দল। শোনা যায় প্রায় পঞ্চাশজন নবাবী সিপাহী তার সঙ্গে জুটে রয়েছে। ভারী বদমাশ। সব থেকে বড় লোভ তার ঔরতের উপর। তারপর টাকা।

—ঝুমঝুমি!

—হুঁ? দাঁড়ালা ক্যানে গ?

—বনে ডাকাত আছে।

—ডাকাত তো থাকেই গ। আমরাও তো করি। হাট লুটে নিয়ে আসি। গাঁ লুটি।

—না। এরা বড় ডাকাত। শোভানের দল।

—অ! তা হলি? কি করবেক?

—ভয় লাগছেক তুর?

—ভয়? না। তোমার সঙ্গে রইছি। বাঘনখী রইছে। ভয় ক্যানে করবেক!

—ওরা যদি ধরে তুদের?

—উদের কথা আমি কি করে বুলব?

—তুর কথা?

—মরে যাব। অত্যন্ত সহজ সুরে বললে ঝুমঝুমি।

—বাস্, চল্।

বনের মুখেই পথে গণ্ডার দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে, আজ যাবেক নাই নাকি? বাবা, কি ভুক করছিলা ঠাকুরের কাছে!

—চল্, চল্। বলব সব। বিপদ বটেক!

—বিপদ! সদ্দারের লোক আইছে?

—উঁহু। বনে বিপদ।

—বাঘ?

—না। শোভান ডাকাতের দল।

চমকে উঠল গণ্ডার—শোভানের দল!

—হাঁ।

—তবে না হয় আজ রেতে যেঁয়ে কাজ নাই হে ছোট সর্দার। থাকা থাক। সর্দারের কিল চড় বকুনি সিতো আছেই। কিল ধমাধম পড়ে সই কিল ধমাধম পড়ে, সি পড়বেকই। না হয় দু কিল বেশি পড়বেক। কি ঝুমঝুমি?

—উকে যেতেই হবেক। ঠাকুর বলেছে, রাতে যেঁয়েই মাকে একটো কথা বলতে হবেক।

—তাহ

—তাহলে তুরা না হয় থাক, উতে আমাতে চলে যাই।

—তুরা যাবি, তুদের ভয় নাই? বেশ বাঁকা সুরেই গণ্ডার জিজ্ঞাসা করলে।

অর্জুন চুপ করে পথ হাঁটছিল। তার মধ্যে কে যেন একটা বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। সে বোঝার মধ্যে আছে তার নতুন পরিচয়, সে ছত্রি। সে রাজার ছেলে। তার মা বামুন ছত্রি ঘরের সতীর মত সতী। তার মা তার বাবার—না, কথাটা তার জিভে আর আসছে না। তার মাকে তার বাবা রাজা মাধব সিং মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেছিল। তার সঙ্গে আরও কটা রহস্যময় নামের ভার, চন্দনগড়ের বিপদ, তার মাকে আজই বলতে হবে: রাজা মাধব সিং। তার বিধবা মেয়েকে দাবি করেছে পাঠানে নিকা করবে। সে তার বোন। সে মাধব সিং-এর ছেলে। সুচেত সিং-এর কুমারী মেয়েকে চেয়েছে শাদি করবে। সে ছত্রি। মেয়ের সতীত্ব ইজ্জত তাকে প্রাণ দিয়ে বাঁচাতে হয়। মাকে খবর দিয়ে সে আসবে চন্দনগড়ে। ঠিক করে ফেলেছে সে। চন্দনগড় লুঠ করে নেবে বর্গীতে। হয়তো দখল করে নেবে পাঠানে। সে যাবে। ভাবতে ভাবতে চলছিল সে। ঝুমঝুমি কথা বলছিল গণ্ডারের সঙ্গে। এবার গণ্ডারের কথাটা তাকে যেন একটা ঝাপটা দিয়ে গেল। সে বললে, ভয় রইছে বইকি গণ্ডার। কিন্তু করব কি! ছত্রিকে ভয় করতে নাই।

—ছোট সর্দার! চমকে উঠল গণ্ডার।

—হাঁ রে গণ্ডার। ঠাকুর আমার সব জানে। উ আমার মায়ের গুরু বটেক। বুঝলি, আমার চেহারাটো ঠিক আমার বাবার মত বটেক, দেখেই চিনে ফেলালছে। বললে, তুমি ছত্রি বটে। তোমার মাকে তোমার বাবা মন্তর পড়ে বিয়ে করেছিল। আবার বাবা আমার রাজা ছিল। সিদিন মা শঙ্করীর গলা থেকেন পৈতে নিয়ে আমাকে পরায়ে দিয়ে বললে, তুমি ছত্রি। তুমি রাজার বেটাও বট। ই কদিন ই সব কথা তুদিকে বলতে বারণ ছিল বলে বলি নাই। আজ না বললে নয় রে। তা ছত্রি হয়ে রাজার বেটা হয়ে ভয় কি করে করি বল্?

—ছোট সর্দার! দাঁড়াও।

—ক্যানে?

—তোমাকে পেনাম করি হে। দণ্ডবৎ করি। না জেনে কত কি পাপ করলাম বল দেখি নি। হায় হায় গ কিষণজী! হে বাবা ভগবান!

—দূর। সে সব অজান্তি। উতে পাপ নাই। তা ছাড়া বুঝলি কিনা, ঠাকুর বলেছে আচার আচরণ বাছবিচার আমার নাই। শুধু ছত্রি ধরম মানলেই হবে। এই দেখ ভক্তি একটা দিলেক কি, ই যতক্ষণ থাকবেক যমে কিছু করতে লারবেক। ঝুমঝুমিকেও একটা মাদুলি

দিয়েছে।···দেখা ক্যানে গ। আর উকে কি বললে জানিস।

ঝুমঝুমি বললে, না, সি ক্যানে বলবে তুমি?

—ক্যানে বলব না আমি—অঁ?

—বড়া বেহায়া হে তুমি।

—সি তো বটে। তুকে তো কাঁধে নিয়া নাচি, নাচতে পারি। শুন্ গণ্ডার, বললেক ঠাকুর ঝুমঝুমি নায়িকে মেয়ে বটে। নায়িকে বুঝিস তো? হ্যাঁ, মায়ের সব ডাকিনী যোগিনী থাকে তেমুনি নায়িকে থাকে। উ আমার শক্তি বটেক। বুঝলে, উর অপমান করলে ভাল হবেক নাই।

গণ্ডার বললে, এই দেখ।

—কি?

—ঝুমঝুমি কাঁদছেক।

—ঝুমঝুমি! না, অপরাজিতে। উর নাম দিলে ঠাকুর অপরাজিতে।

গণ্ডার বললে, ওরে বানাস রে! হেই বাবা!

হঠাৎ তিনজনেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল। গণ্ডার অবাক হয়ে ভাবছিল। ঝুমঝুমি কাঁদছিল পরম সুখে। কাঁদছিল আর চোখ মুছছিল। অর্জুন ভাবছিল শক্তিতে হাত দিয়ে, এই শক্তি এ দেবতার প্রসাদ। এর বল তার দেহে তার মনে তার হাতের হাতিয়ারে ছড়িয়ে পড়বে নিশ্চয়। তখন কিসের ভয়! পঞ্চাশ জনের সামনে জয় মা শঙ্করী, জয় কিষণজী বলে তলোয়ার ধরে দাঁড়াবে। চোখ থেকে বেরুবে আগুন, অস্ত্রের ধারে জ্বলবে আগুন, তার হাঁকে বেজে উঠবে বাজের ডাক। শত্রু থমকে যাবে। তারা থরথর করে কাঁপবে। অনায়াসে সে জয় কালী বলে কেটে ফেলবে। তখন সবাই হাত জোড় করবে।

* * * *

সবসুদ্ধ ওরা ছিল একত্রিশজন। পঁচিশ জন পুরুষ ছজন মেয়ে। কেউ থাকল না। মেয়ে পুরুষ সবাই কাপড়চোপড় সেঁটে লড়াই দাঙ্গার সময় যেমন পরে তেমনি করে পরে নিলে। মেয়েরা কাছা দিয়ে কাপড় পরে বুকের কাপড় সেঁটে টেনে পাক দিয়ে কোমরে জড়িয়ে গিঁঠ দিলে। সে প্রায় গায়ে আর একপরদা চামড়ার মত হয়ে গেল। চুলগুলো মাথার উপরে রাখলে ঝুঁটি করে। তার উপর কাপড় বা গামছা দিয়ে পাগড়ি করলে। পুরুষেরা মালসাঁট দিয়ে কাপড় পরে নিলে। অন্ত কাপড় দিয়ে মাথায় পাগড়ি করলে। গামছাখানা কষে বাঁধলে কোমরে।

মেয়েরা বাঁ হাতে বাঘনখী পরলে, কোমরে একটু পিছন দিকে হালকা মাঝারি আকারের বগি দা গুঁজলে। লম্বা বড় গাছে উঠে ডাল কাটবার সময় যেমন করে গুঁজে দেয় তেমনি-ভাবে। ডান হাতে রইল ওদের লাঠির মত হালকা সড়কিগুলো।

পুরুষেরা হাতিয়ার ভাগ করলে। গণ্ডারের সর্দারিতে দশজন নিলে লাঠি। মাথায় তার লোহার বোলো পরানো। যার ঘা লাগলে মাথা ফেটে যাবে। দেহের যেখানে লাগুক হাড় ভাঙবেই। তা ছাড়া কোমরে গুঁজলে বড় বগি দা। যার এক কোপে দুটো পাঁঠা একসঙ্গে

কাটা যায়। আর পিঠে বাঁধলে সড়কি। আটজন নিলে তীর ধনুক বগি দা, চারজন নিলে সড়কি তলোয়ার বগি দা। তার নায়ক নিজে অর্জুন। দুজন শুধুমাত্র কপনি পরে কোমরে ছোট বগি দা গুঁজলে। একজন বাড়তি লাঠি তীর ধনুক নিয়ে চলল। ওরা থাকতে আজ কেউ চায় নি।

গণ্ডারই সব বলেছিল ওদের। অর্জুন থম হয়ে বসেছিল। সে থমথমে হয়ে গেছে। পাশে বসেছিল গায়ে গা দিয়ে ঝুমঝুমি। তাকে মধ্যে মধ্যে অর্জুন বলেছিল, মদ দে।

ঝুমঝুমি দিচ্ছিল অল্প অল্প করে। সে একবার বললে, কম করে দিচ্ছিস ক্যানে?

—কম করে খাও। মাতাল হলে তো চলবেক নাই। ভাব। ভেবে দেখ।

—হুঁ, ঠিক বলেছিস। বেশি চাইলে তু দিস না।

গণ্ডার বলছিল, যা সে শুনেছিল অর্জুনের মুখে। সে ঝুমঝুমিকে বলেছিল, দেখা ঝুমঝুমি ছোট সর্দারের পৈতেটো আর তক্তিটো। দেখা তো—

ঝুমঝুমি দেখিয়েছিল। গণ্ডার বলেছিল, ইবার তুর কবচটা দেখা। ওই দেখ্। ঠাকুর উকে কি বলেছে জানিস, বলেছে উ ছত্রিশ জাতিয়ার ঘরে জন্মালে কি হবেক, উ হল নারিকে কন্তে। মায়ের ডাকিনী-যোগিনী তারাই মন্তে আসে নারিকে হয়ে। উ ছোট সর্দারের শক্তি বটেক। উকে অপমান করলে সর্দারের ভাল হবে নাই। উর ঝুমঝুমি নাম বদুলে নাম দিয়েছে অপরাজিতে। ছোট সর্দার ছত্রি, ছোট সর্দার রাজার ছেলে।

সকলে হাঁ করে শুনছিল। সভয়ে দেখছিল পৈতে-পরা তক্তি-পরা গম্ভীর অর্জুন সিংকে। অর্জুন সিংকে সিংহ উপাধিধারী বলে তাদের কোনদিন মনে হয় নি। তার গড়ন, তার চেহারা, তার গায়ের বর্ণ তাদের থেকে পৃথক বটে। কিন্তু সে কখনও তাদের থেকে পৃথক ছিল না। সর্দারের নাতি সে ছোট সর্দার। তার আলাদা বন আছে, তার পয়সা তাদের থেকে বেশি এও তাদের কখনও পীড়া দেয় নি। তার যতক্ষণ থাকত ততক্ষণ যার যা দরকার হয়েছে দিয়েছে। সে তাদের সঙ্গে খেলা করেছে, তাদের সঙ্গে হেসেছে, তাদের সঙ্গে নেচেছে গেয়েছে। শিকার করেছে একসঙ্গে, এক পাতায় খেয়েছে পর্যন্ত। বললে বলেছে, দূরা জাত। জাত কি রে? উ মা মানে মানুক। আমি মানি না। একসঙ্গে না খেলে আমোদ হয়? এক সমান হয়? লে, খা। আর জাত থাকলে সে মারেক কে রে? তার নামটি কি বটেক? ভাগ্। বনে তাদের এঁটো পাত্রেই মদ খেয়েছে। সে চিরদিন উল্লাসময়। হা হা হাসি আর উঁচুগলার কথা সব দুঃখ বিমর্ষতাকে মুছে দিয়ে মুহূর্তে হল্লা উঠিয়েছে। আজ সেই অর্জুন থমথম করছে। কথা বলছে না। ভাবছে। তার মাথায় কি যেন একটা চেপেছে।

গণ্ডার সব বলে বলেছিল, সিং বলছে, তুরা সব রাতটোর মতন এখানে থাক। দিনে দিনে কাল যাবি। উ চলে যাবে রেতে রেতে ঝুমঝুমিকে নিয়ে ছত্রিশ জাতিয়া জঙ্গলে মাকে খবর দিতে। রেতেই খবরটি দিতেই হবেক। ঠাকুরের হুকুম বটেক। কাল একাদশীর সাত। কালকেই মাকে যা হয় করতে হবেক। কাল শুভদিন।

রতন পাইক বললে, তাই হয় নাকি নি। আমরা থাকবকটা ক্যানে?

—আমরাও যাব। হা-রে-রে-রে করতে করতে চলে যাব। বাঘ ছামুতে এলে শালার

স্নান লিব। ডাকাত এলে তাকে অ্যাই মারব লাঠি।

বলে লাফিয়ে উঠে নিজের লাঠি দিয়ে আঘাত করেছিল একটা গাছের গুঁড়িতে। রাত্রির বন। আঘাতের ঠুই শব্দটা বিচিত্রভাবে গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছুটে গিয়ে অনেক—অনেক দূরে গিয়ে তবে যেন মিলিয়ে গিয়েছিল।

সকলে বলে উঠেছিল, হাঁ তো কি। সবাই যাব আমরা। মেয়েগুলান না হয়—

একটা মেয়ে বলেছিল, মর্ খালভরা! মেয়েগুলান থাকবেক পড়ে! ক্যানে রে মুখপোড়া! আর একজন বলেছিল, আমরা কি খোঁড়া নাকি? না, তুর কাঁধে চড়ে যাব বলেছি? মরণ! আমরা সবাই যাব। যদি সাথে সাথে চলতে না পারি তো ফেলে চলে যাস্।

এতক্ষণে কথা বলেছিল অর্জুন। বলেছিল, হঁ। গেলে সবাই যাবেক। তাই চল্। একসাথে অনেক খেল হল রে ভাই, আজকের খেলাটাও হোক।

—সাবাস, সাবাস, সাবাস! একসঙ্গে বলে উঠেছিল সকলে।

—একটি কথা কিন্তু—

—বল।

—পা ছুটবেক, চোখ দেখবেক, ইশারা দিবেক কিন্তু কথা নয়। বন, রাতের বন। বাঘ শিকার মনে রাখতে হবেক। শালা বাঘ রইছে বনে। আব্দুস সোভান।

সবাই কথা বলে উঠল একসঙ্গে, কিন্তু চাপা গলায়, ঠিক বলেছ। চাপা গলার দুটি কথা আশ্চর্য রকমের ভারী এবং ভয়ঙ্কর মনে হল ওদের কাছেই। তার সঙ্গে মিলল মৃদু বাতাসে আন্দোলিত বনের পাতার খসখস শব্দ।

অর্জুন বললে, মদ খেয়ে লে। কিন্তুক বেশি নয়। বাকি ফেলে দে। মদ খেয়ে মাতাল হলে হবেক না। তার পরেতে—

অনেক ভেবে রণনিপুণ সেনাপতির মত বনের জোয়ানেরা নিজেদের ছোট বাহিনীকে সাজালে।

শুধুমাত্র কৌপীন পরে কোমরে ছোট ধারালো বগিদা গুঁজলে খোঁতন আর ছিদাম। পাতলা ছিপছিপে ষোল সতের বছরের দুই কিশোর। তারা গাছে চড়ে বাঁদরের মত; ঘন গাছ যেখানে সেখানে তারা মাটিতে নামে না, গাছের ডালে ডালে চলে যায় স্বচ্ছন্দে।

ঝুমঝুমি বললে, সর্বাঙ্গে নিমের তেল মা॰॰। তার সঙ্গে আমার ঝুলিতে রইছে শেকড় পাতা। বিছে পোকা-মাকড়ের ওষুদ। বেটে মিশায়ে লে তেলের সঙ্গে। গন্ধ উঠবেক। সে গন্ধে পোকামাকড় পালাবে বিশ হাত। তবে ভাই, ইয়ের পরে গায়ের ছাল উঠে যাবেক এক-পুরু মরামাসের মত। ঘা হবে নাই, ভয় নাই। সাপও ঘেঁষবে নাই।

—বহুৎ আচ্ছা। ছাল উঠলে শালা ফরসা হবেক রঙ। লে রে, মাখ্। ছিদাম আর খোঁতা আগে আগে চলবে। বড় গাছে চড়বে। চড়ে বনের চারিদিক দেখে বলবে কোথাও আলো আছে কি না। আগুন কিংবা মশাল। কান পেতে শুনবে, আওয়াজ শুনলে বলবে, ততক্ষণে ছিদাম আরও কতকটা এগিয়ে অন্য গাছে চড়ে দেখবে।

স্থির হল নিরাপদ দেখলে লক্ষ্মীপেঁচার প্রহর ঘোষণার মত ডাক ডাকবে। বিপদ দেখলে ডাকবে কালপেঁচার ডাক।

নিচে চলবে তেইশ জোয়ান আর ছজন মেয়ে। আটজন তীর ধনুকধারী প্রথম, তারপর লাঠিয়াল দশজন। তারপর তিন তলোয়ারধারী; তারপর নিজে অর্জুন, তার পাশে ঝুমঝুমি। তার পিছনে পাঁচজন মেয়ে, তাদের কোমরে পিছন দিকে গোঁজা বগি দা, বাঁ হাতে বাঘনখী। ডান হাতে সড়কির মত হালকা বল্লম; তার পিছনে বাকি লাঠির বোঝা মাথায় গণ্ডারের মতই বলশালী হাঁদা। আলো নয়। মশাল আছে। সে লাঠির বোঝার সঙ্গে রইল। বোঝার সঙ্গে আরও রইল মেলায় কেনা জিনিস।

দেবীপক্ষের দশমীর রাত্রি। রওনা হতে ওদের এক প্রহর হয়ে গেল। চাঁদ পূর্বদিকে আকাশের মাঝখান পার হয়ে খানিকটা উপরে উঠেছে। আকাশ নীল। একেবারে ঝকঝক করছে। তারা উঠেছে। তলোয়ারধারী কালপুরুষ সামনে, চাঁদের ওপারে খানিকটা পশ্চিম দিকে। তা বাঁয়ে রেখে তাদের যেতে হবে দক্ষিণ মুখে। তারপর পশ্চিম মুখে। পথ নেই। মানুষ বড় চলে না এদিকে। এই তো ক্রোশখানেক ক্রোশ দেড়েক পাশে সড়ক চলে গিয়েছে পুরী পর্যন্ত। ঘাটাল চন্দ্রকোণা হয়ে বীনপুরকে ডাইনে রেখে দক্ষিণ মুখে ঘুরে ঝাড়গ্রাম হয়ে চলে গিয়েছে। সুবর্ণরেখা পার হয়ে নয়াগ্রাম হয়ে সেই দাঁতনের রাস্তায় মিশেছে। মাঝে মাঝে ছোট সড়ক বেরিয়ে এদিক ওদিক গিয়েছে। যাত্রীরা এই পথে চলে। নাগরী ফৌজ বর্গী ফৌজও এই পথেই চলে। মধ্যেমাঝে এ ওর চোখে ধুলো দিতে বনে ঢোকে বটে। কিন্তু সে আগে থেকেই বোঝা যায়। এবং তারাও যেমন তেমন পথ একটা রাখে কাছাকাছি। এটা ছত্রিশ জাতিয়াদের নিজস্ব পথ। এ পথের ইশারা ওরাই জানে। কোথাও গাছে, কোথাও পাথরে, কোথাও ঝোপে নিশানা দেওয়া আছে। দিনে তো দেখা যায়ই—রাত্রেও তাদের হুঁশিয়ার চোখে অনেক কিছু পড়ে। অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষের রাত্রেও পড়ে, সাদা ধবধবে খড়ি মাটির মোটা চাঁই। ওগুলো এক রশি দু রশি অন্তর রাখা আছে। আজকের রাত্রি অন্ধকার নয়। আকাশে চাঁদ। বনের ভিতরটা গাছের মাথার ঢাকা সত্ত্বেও আবছা আভা ফুটছে। গাছের ডাল পাতার ফাঁক দিয়ে লম্বা লম্বা ফালির মত জ্যোৎস্না এসে মাটিতে পড়েছে। গাছের গুঁড়িতে পড়েছে চুনের দাগের মত।

উদ্যোগ করতে প্রথম প্রহরের শেয়াল ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল অর্জুন, জয় মা! জয় কিষণজী! চলো। শিয়াল যা-তা নয়, শিয়াল শিবা। শিবার ডাক। ইশারা। চলো। ওরা একত্রিশ জন চলেছে। একত্রিশ জনের পায়ের শব্দ উঠছে শুধু। আর বনে পাতা নড়ার শব্দ। আর মধ্যে মধ্যে একটু আগে বনের গাছ থেকে লক্ষ্মীপাঁচার ডাক—কুক্ কুক্ কুক্। কুক্ কুক্ কুক্। ওরা গাছতলা পৌঁছুতে পৌঁছুতে ঝুপ করে গাছ থেকে নেমে পড়ছে হয় ঘোঁতন, নয় ছিদাম। কেউ জিজ্ঞাসা করছে, কি রে?

সে বলছে, কোথা পাবা? উদর গুল।

ওরা চলেছে আবার। আবার সামনে কোন গাছ থেকে শব্দ উঠছে—কুক্ কুক্ কুক্।

কিছুক্ষণের মধ্যেই থমথমে নীরবতা কেটে গেল। দুটো চারটে ফিসফিসানি কথা, হাসি,

গাছের পাতার খসখসানির সঙ্গে মিশতে লাগল।

বনের মধ্যে জন্তুরা ইশারা দিচ্ছে। ঝিঁঝিরা গানের জাল বুনছে। মধ্যে মধ্যে খেঁকশিয়াল খ্যা-খ্যা-খ্যা-খ্যা শব্দে ডেকে উঠছে। রাত্রিচর পাখি ডাকছে—যেন হাসছে। কখনও পাশের জঙ্গল নাড়া দিয়ে শেয়াল বা খরগোশ কি সজারু ছুটে পালাচ্ছে।

মানুষ থাকলে এরা সাড়া দেয় না। এক ঝিঁঝি ছাড়া সবাই চুপ করে থাকে। একটা মেয়ে, নাম আদুরী। সে ফিসফিস করে বললে, আঃ! মিছে মদগুলান ফেলে দিলে লো! টুকচা হলে কেমুন হত!

অর্জুন বললে মৃদু স্বরে, কাল তোকে মদের জালাতে ডুবায়ে দিব রে।

আবার চলল তারা। কতক্ষণ চলেছে ঠিক নেই। তবে অনেকক্ষণ মনে হচ্ছে। অনেকক্ষণ, কিন্তু পথের নিশানায় তো বেশি মনে হচ্ছে না। পাঁচ ক্রোশ পথ, এখনও দু ক্রোশ আসে নি। দু ক্রোশের মাথায় একটা সড়ক চলে গেছে পুব-পশ্চিমে চন্দনগড় থেকে বেরিয়ে পুরীর বড় সড়কের সঙ্গে মিশে আবার একটা ফ্যাঁকড়া চলে গিয়েছে বনের ভিতর দিয়ে। গিধনী পাশে পড়ে থাকবে, বীনপুর আর এক পাশে। তারপর দুটো ফ্যাঁকড়া। একটা গিয়েছে পশ্চিমে ধলভূম মানভূম। অন্যটা উত্তর মুখে বাঁকড়া। সে সড়ক এখনও পার হয় নি তারা। তবে এলো বলে; আর দেরি নাই।

হঠাৎ একটা বিশ্রী শব্দের তীর যেন সকলের কানে পাশ দিয়ে সর্বাঙ্গ শিউরে দিয়ে ছুটে চলে গেল—ক্যাঁ—ক্যাঁ—ক্যাঁ।

কালপেঁচার ডাক। দলটি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সকলের হাতিয়ার ধরা হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠল। একটা মেয়ে বলে উঠল, বাবা টেঃ!

চাপা গলায় শব্দ হল, চু—প!

আর পায়ের শব্দ উঠছে না। বনে পাতার খসখসানি শব্দ উঠছে শুধু। ঝিঁঝি ডাকছে। জন্তুর শব্দ? কই?

দ্রুত এগিয়ে যেতে যেতে অর্জুন বললে, মেয়েরা গাছে চড়ে যা। হাঁ। আর সব তৈয়ার থাক্।

সে গিয়ে গাছের তলায় দাঁড়াল। প্যাচাটা এখনও ডাকছে।

এ কি? মানুষের সাড়া?

সড়ক দিয়ে পথ চলছে রাহীর দল। বেহারার বুলি শোনা যাচ্ছে। এ কি? আলো? ও। মশাল ফুঁ দিয়ে জেলে পথ দেখে নিচ্ছে। কিন্তু? যাদের সঙ্গে বেহারা পাল্কী বা ডুলি আছে তারা মশাল নিভিয়ে দিচ্ছে কেন? মধ্যে মধ্যে জ্বালছে।

ঝুপ করে নামল ছিদাম।

—কি?

—জনা বিশ লোক। ডুলি সঙ্গে রয়েছে দু-তিনখানা না কখানা বোঝলাম না। মশাল জেলেই নিভিয়ে দিলেক। আরও একটো আলো সর্দার উই বাঁকটোর মোড়ে। বুয়েছ আমি গাছে উঠেছি, ইদিক থেকে একটো লোক ছাঁবাজীর মতন সাঁ করে চলে গেল। আমি উপরে

উঠে দেখলাম বাঁকের মোড়ে আলোর ছটা। দেখছি, এমন সময় দপ্ করে নিবে গেল; তবে জ্যোস্না রয়েছে তো! লোক আছে। বেশ জনা কতক।

—ওঠ, আবার গাছে ওঠ। দেখ।

ছিদাম মুহূর্তে একটি ছোট লাফ দিয়ে একটি ডাল ধরে দুলে উপরে উঠে গেল।

সেই মুহূর্তে ওই বাঁকটায় একটা পৈশাচিক চিৎকারে রাত্রি চমকে উঠল।

—সর্দার! ডাকাত! ডুলির দলটাকে মারছে।

মনের উত্তেজনায় ছুটে বন থেকে বেরিয়ে এসে সড়কের উপর দাঁড়াল। রশি দেড়েক দূরে চিৎকার উঠছে। হা-হা-হা চিৎকার। হিংস্র উল্লাসের পৈশাচিক চিৎকার।

দপ-দপ করে মশাল জ্বলে উঠছে। আগুনওয়ালা মশালে ফুঁ দিয়ে জ্বালছে মশাল, ডাকাতেরা। শিকার পেয়েছে তারা।

কে তার অঙ্গস্পর্শ করলে! কে? ঝুমঝুমি!

ঝুমঝুমি বললে, ভিতরে চোক। দেখতে পাবে।

—না, তু গাছে ওঠ্ গিয়ে। যা। আমাকে ডুলি বাঁচাতে হবেক।

—তা হলে আমি তুমার সাতে থাকব।

—ঝুমঝুমি! কথা সে বলছে কিন্তু তাকিয়ে আছে সে ওই দিকে। মশালের লাল আলোয় সব দেখতে পাচ্ছে। তিনটে ডুলি। সঙ্গে জন আষ্টেক পাহারার লোক। আটজনকে চল্লিশজন আক্রমণ করেছে। বন্দুকের শব্দ উঠল। পাহারাদারদের হাতের বন্দুক গর্জে উঠল। ওদিকে পড়ল জন কয়েক ডাকাত। তারপর বাকি ডাকাতেরা ছুটে এল চিৎকার করে। লাঠিতে তলোয়ারে চলছে লড়াই। বেহারারা পালাচ্ছে।

চিৎকার উঠল অকস্মাৎ। নারীকণ্ঠের চিৎকার।

চমকে উঠল অর্জুন—ভগবান! রক্ষা কর—ভগবান!

একটা লোক ঘোড়ায় চড়ে বন থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। হাসছে। কজনে ডুলির ভিতর থেকে মেয়েদের টেনে বার করছে।

অর্জুনের বুকের ভিতরটায় কি যেন তাকে ঠেলছে। সে ঝুমঝুমির হাত ধরে টেনে বনের ভিতর ঢুকে বললে, তৈয়ার হো যা রে। তৈয়ার। তীর ধনুক। ওরে, তীর ধনুক। সবাই নে। চল্, বনে বনে ছুটে চল্। দু ভাগ হয়ে। এক ভাগ এদিক এক ভাগ ওদিক। মশাল জ্বলছে। চাঁদের আলো রয়েছে। গাছের আড়াল থেকে প্রথমে তীর। তারপর হাতিয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবেক। গণ্ডার, পেথমেই আমি আর রামু দুপাশ থেকে ঘোড়াওয়াকে লিব। বুঝলি? ওই—ওই সর্দার! ওই শোতান! হুঁশিয়ার! যা যা যা। দু ভাগ। বাঘের মতন চুপি চুপি—

ওদিকে তখন হা হা চিৎকারের সঙ্গে মানুষের মরণ আর্তনাদ ধ্বনিত হচ্ছে। মশালের আলোয় ভয়াল হয়েছে রাত্রি এবং বন। আটজন রক্ষকই পড়েছে। ডাকাতদেরও কজন। গুলিতেই প্রথম পড়েছে চার-পাঁচজন। সে অর্জুন দেখেছে।

ডুলির ভিতর থেকে টেনে বের করেছে তিনটি মেয়েকে। চেপে ধরেছে তাদের হাত।

ঘোড়ায় চড়ে শোভান হাসছে।

হঠাৎ ছুটি তীর দু দিক থেকে এসে বিঁধল শোভানকে। একটি কাঁধে, একটি বুকে। সে চিৎকার করে উঠল—আ! দুশমন!

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা তীর কপালে। তার সঙ্গে আরও কজন ডাকাত বিদ্ধ হয়েছে তীরে। চীৎকার উঠল—বুঝাও, মশাল বুঝাও রে। জলদি!

মাটির উপর জলন্ত মশাল গুঁজে দিল তারা।

তীর আবার এক ঝাঁক এসে পড়েছে দু দিক থেকে। ডাকাতেরা চিৎকার করে হল্লা করে উঠল, দুশমন! কিন্তু কই? কোন্ দিকে?

একজন বলছে, সর্দার পড়ে গিয়েছে। খতম।

তারপরই আবার এসে পড়ল সড়কি। পঁচিশ হাত জোয়ান লাঠি তলোয়ার নিয়ে উন্মত্ত তাণ্ডবে প্রেতের মত চিৎকার করে দু পাশে বন থেকে বেরিয়ে এসে পড়ল তাদের উপর। তাদের সঙ্গে একটা কালো ছিপছিপে মেয়ে। হাতে তলোয়ার।

অনেক ডাকাত পড়েছে। প্রায় বাইশ-চব্বিশ জন। প্রথম রক্ষকদের গুলিতে এবং তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে আটজন। আর আকস্মিক এই আক্রমণে পনের ষোল জন। পাইকদের লাঠি বড় সাংঘাতিক। মাথা দু ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। তার উপর নায়ক পড়েছে। তারা ছুটে পালাল। পালাল প্রায় কুড়িজন।

গণ্ডার কজনকে নিয়ে চিৎকার করতে করতে তাদের অনুসরণ করলে।

—গণ্ডার, ফিরে আয়। গণ্ডার—

গণ্ডার একজনের চুলের মুঠো ধরে টেনে এনে সামনে ফেলে দিলে।

ভুলি যাত্রী মেয়ে তিনটি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁপছে এখনও। অর্জুন তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হাত জোড় করলে। এরা যেন রাজার ঘরের মেয়ে। তার মায়ের মত। একজনের বয়স বেশী।

তিনি কি বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বলা হল না। মেয়ের গলার একটা ক্রুদ্ধ অথচ শঙ্কিত চিৎকারে চমকে উঠলেন। অর্জুন চমকে উঠে চিৎকার করলে, ঝুমঝুমি!

ঝুমঝুমি উপুড় হয়ে পড়ছে একটা ডাকাতের উপর।

—ঝুমঝুমি!

ঝুমঝুমি উঠছে। সে উঠল। তার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হয়ে গেছে। বাঁ হাতের বাঘনখে ডাকাত-টার পেট চিরে তার নাড়িভুঁড়ি তুলে এনেছে; লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে সকলের অজ্ঞাতসারে তলোয়ার তুলেছিল। ঝুমঝুমিও পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘনখ বিঁধে দিয়েছে।

সে অর্জুনের পাশে এসে দাঁড়াল।

বয়স্কা মহিলা যিনি, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কে?

—আমরা মা, মানুষ বটি বনের। যেতে যেতে দেখলম আপনাদের বিপদ, ছুটে এলম।

—তোমরা ডাকাত নও?

—না মা। এখন ডাকাত লই। মিছা বলব ক্যানে—হাট টাট লুট করি। যেমন করে পাইকরা।

—তোমরা পাইক?

—হঁ। পাইক বটি। বটি বইকি।

—তুমি বাগ্দী?

—না। আমি ছত্রি।

—ছত্রি?

—হঁ। এই দেখেন পৈতে। তাতেই তো ছুটে এলম মা। গুরু বলেছে ছত্রির এই ধরম।

ঠিক এই সময়ে একটা মশাল জেলে নিয়ে এল গণ্ডার—সর্দার!

—হঁ—

—যা আছে লিয়ে লি ডাকাতগুলার? তরোয়াল, ঢাল, সড়কি, বন্দুক—

গণ্ডারের কথা ঢাকা দিয়ে মেয়েটি তীক্ষ্ণ বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ছত্রি?

বিস্ময়ের আর অবধি রইল না অর্জুনের। সে মুখ তুলে আরও বিস্মিত, বিস্মিত কেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। এ কি মহিমা! এ কে!

—তুমি ছত্রি?

—হাঁ মা।

—তোমার বাবার নাম কি? কে তোমার বাবা?

—আমার বাবার নাম রাজা মাধব সিং। আমি তাকে দেখি নাই। বলেই আমার জন্ম। বাবা যখন মরে আমি তখন মায়ের পেটে ছিলম। আমার দাদো আমার মাকে লিয়ে পালিয়েছিল। লইলে মায়ের সঙ্গে আমাকেও মেরে ফেলাতো তাহলে।

—হাঁ বাবা। ফেলত সে রাক্ষসী। আজকের কথা ভাবত না। হাসলেন।

অর্জুন বললে, গুরু বললে, অর্জুন, আজ রেতেই যাও। কাল একাদশী। মাকে বলবা একটি কথা। চন্দনগড়ের বিপদ। আর শুধায়ো তোমার পরিচয়। বলো, গুরু বলতে বলেছে। সময় হয়েছে। আমি সব জানি না।

—হয়েছে বাবা। সময় হয়েছে। রুক্মিণীকে বলতে হবে না। আমি বলব। আমি বলব সব কথা। কিন্তু আর দেরি করো না বাবা। চলো। ডাকাতরা আবার তো দল বেঁধে ফিরতে পারে।

গণ্ডার বললে, হাঁ মাঠাকরুণ। এক বেটাকে ধরেছিলাম। তাকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে সব খবর লিয়েছি। শোভানের বড় দল গিয়েছে লালতেহাটের দশমীর মেলা লুটতে। আর শোভান নিজে এখানে ছিল, তোমরা পালিয়ে যেছ কোন কুটুম বাড়ি সেই খবর পেয়ে। তোমাদের বেহারাদের মধ্যে একজনা গুপ্তচর ছিল মা।

—শোভানের মুণ্ডুটা আমাকে এনে দিতে পার?

অর্জুন নিজে গিয়ে মুণ্ডুটা কেটে নিলে। সেটা তুলে আনলে ঝুমঝুমি—দাও মা।

—এটি?

—উ আমার বটে মা।

—তোমার?

—হাঁ মা, আমার।

—হে ভগবান! চল বাবা—চল।

—চড় মা ডুলিতে।

—বেহারা তো নেই।

—আমরা পঁচিশ মরদ রয়েছি। বারো জনায় তিন ডুলি হৈ হৈ করে নিয়ে যাব।

—দাঁড়াও বাবা, ভাবি।

—কি ভাবছ মা?

—চন্দনগড় যাব, না রুক্মিণীর কাছে গিয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়াব!

—আমার মাকে তুমি জান মা?

—জানি।

—আমার বাবাকে? তিনি সত্যিই রাজা ছিল?

—হাঁ। চন্দনগড়ের রাজা মাধব সিং ছিলেন তোমার বাবা।

—চন্দনগড়ের রাজা মাধব সিং আমার বাবা!

—হাঁ। তুমিই চন্দনগড়ের রাজা। তোমার মা শুক্রী রাজপুতের মেয়ে। শুক্রীরা পৈতে হারা, তাই তাদের মেয়ে বিয়ে করেছিল বলে আমার সহ্য হয় নি। ভেবেছিলাম শশুর বংশের জাত ধর্ম গেল। তাঁকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু—

অবাক হয়ে শুনছিল অর্জুন। তার গা ঘেঁষে ঝুমঝুমি। তার চারিপাশে সকলে।

তিনি বললেন, ভগবান সাক্ষী, তাঁকে খুন করাতে আমি চাই নি। না, চাই নি। কিন্তু, আমার ভাই, বিশ্বাসঘাতক ভাই, পিশাচ ভাই মীর হবিবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হত্যা করেছিল এই বিজয়া দশমীর দিন। তারপর—যখন হয়ে গেল—তখন আমি বলেছিলাম, তা হলে রুক্মিণীকেও মেরে ফেল। নইলে ওর গর্ভের সন্তান একদিন গদী চাইবে। আমরা আরও দুই সতীন ছিলাম। আমার সন্তান হয় নি। সতীনের ওই মেয়ে। বিধবা। আজ এসেছে শাস্তি। মীর হবিব চেয়েছে চন্দনগড়ের দুই মেয়ে। রাজা মাধব সিং-এর বিধবা মেয়েকে, আর সুচেত সিং-এর মেয়েকে। আমি ওদের নিয়ে পালাচ্ছিলাম। দূরদেশে চলে যাব। সুচেত সিং শঙ্করী মায়ের ওখানে গিয়েছে। আর সেই অবসরে পালিয়েছি। পথে এই বিপদ। তুমি কোথা হতে এসে বাঁচালে। তাই ভাবছি, চন্দনগড় যাব, না তোমার সঙ্গে যাব।

হাত জোড় করে অর্জুন বললে, আমার সঙ্গে চল মা। চন্দনগড়ে বিপদ হবে। ওখানে তা হবে না মা। আমরা বেঁচে থাকতে হবে না।

—তোমার দিদি উনি, প্রণাম কর। তোমার থেকে ক'মাসের বড়।

—দিদি!

অর্জুন মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। এত সুন্দর দিদি! এত রূপ!

—আর ওই আমার ভাইঝি। ওরে হিঙ্গন, তুই প্রণাম কর্।

ঝুমঝুমি অর্জুনের গা ঘেঁষে যেন তার অঙ্গের সঙ্গে মিশে গিয়ে দাঁড়াতে চাইলে।

ভুলি উঠল। অর্জুন বললে হুঁশিয়ারির সঙ্গে, তবে আর ভয় নাই। ওরা আর আসবে না। মশাল জ্বাল।

মশাল জ্বলল।

নয়

ছ বছর পর।

চত্রিশ আওয়া জঙ্গলগড়ের কিষণজীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ছিলেন রত্নাদেবী। মাধব সিং-এর প্রথমা মহিষী। মন্দিরের দাওয়ায় বসেছিল রুক্মিণী। তার দুই পাশে আর দুটি ছত্রি তরুণী। মাধব সিং-এর দ্বিতীয় মহিষীর বিধবা কন্যা ভবানীবাঈ আর সুচেত সিং-এর কন্যা কুমারী হিঙ্গনবাঈ। তারা মালা গাঁথছিল।

জঙ্গলগড়কে আর সে জঙ্গলগড় বলে চেনা যায় না। ছ বছরে তার বহু পরিবর্তন হয়েছে। কিষণজীর মন্দির আর কাঠের নয়, পাথর দিয়ে কাদায় গেঁথে প্রশস্ত চতুষ্কোণ চত্বরের উপর চারিপাশে অলিন্দ-ঘেরা মন্দির হয়েছে। সামনের অঙ্গন সমান করে পাথর বসিয়ে বাঁধানো হয়েছে এখন। চারিপাশে পাথরে গাঁথা ছোট পাঁচিল, প্রবেশপথের দুই পাশে দুটি থাম।

আরও কয়েকখানি পাথরে গাঁথা বাড়ি তৈরি হয়েছে। অলিন্দ ঘেরা একখানি সুপ্রশস্ত বাড়ি, তার চারিপাশে উঁচু দেওয়াল। প্রবেশ দরজাটি সুন্দর। বাড়িটির নাম মাতাজী মহল। এই বাড়িতে থাকেন রত্নাদেবী, ভবানীবাঈ, হিঙ্গন এবং রুক্মিণীদেবী। রুক্মিণী এখন আর শুধু রুক্মিণী নয় এখন তার নাম রুক্মিণীবাঈ অথবা রুক্মিণীদেবী, মাতাজী রুক্মিণীদেবী। রত্নাদেবী রাণীসাহেবা রাজমাতা। দরজার সামনে একজন পাইক একটা বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পাইকও আর সে পাইক নয়, তার মাথায় পাগড়ী, গায়ে একটা কুর্তা, পরনে মালসাঁট মেরে কাপড় পরা। চোখে তার সম্ভ্রম, কান তার সজাগ।

মন্দিরপ্রাঙ্গণের পাশে আর একখানি সুদৃশ্য বাড়ি, তার ফটকেও একজন পাইক। রাজা মহল। তার পাশেই পাথরের একটি নাটমন্দিরের মত খোলা প্রশস্ত স্থান। একদিকে তার প্রশস্ত বেদী। জঙ্গলগড়ের দরবার। সামনে পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত একটি উঠান। চারিপাশে নতুন লাগানো শাল গাছের ঘেরা। পুরনো জঙ্গলগড়ের রুক্মিণী মায়ের আগুনে বলে চেনাই যায় না।

শুধু এই থানটি নয়, গোটা গড় বারো পাহাড়ের চেহারা পাল্টেছে। এই মহলে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকালে প্রথমেই নজরে পড়বে পাহাড়গুলির মাঝবরাবর পাহাড়ের গায়ের জঙ্গলের সবুজের বুক চিরে একটি লম্বা গেরুয়া চাদরের বেড়। যেন গোল পাথরের বুকের পৈতের সাদা

দাগের মত এঁকে দিয়েছে। গোটা চাদরটা অবশ্য চোখে পড়ে না। কোথাও বাঁকের মোড়ে গাছের আড়ালে সবটাই ঢাকা পড়েছে, কোথাও সরু ফালির মত দেখা যায়। তবে একটু অবহিত হয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকালেই বুঝতে পারা যায় যে একটি প্রশস্ত রাস্তা বারো পাহাড়ের বুকের ওপর তৈরি করে চলাচল সুগম করা হয়েছে। পাহাড়ে পাহাড়ে সংযোগ-স্থলের অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গাগুলিতে শক্ত প্রশস্ত পাথরের দেওয়াল হয়েছে। তার উপর পাইকরা সড়কি, তীর, ধনুক, বন্দুক নিয়ে পাহারা দেয়। বমদুয়ারে বড় ফটক তৈরি হয়েছে।

পাইকদের বাড়িঘরের উন্নতি হয়েছে। কয়েকটি পাড়াতে ভাগ করে চার-পাঁচটি পাহাড় নিয়ে এখন তাদের বাস। রাস্তা হয়েছে।

সব থেকে পরিবর্তন হয়েছে নিচের সেই স্যাঁতসেঁতে অবজড়ে জমি ও জঙ্গলের। সেখান-কার জমিতে জঙ্গল সাফ হয়েছে। মাটি এখন শুকনো, তার উপর ক্ষেত হয়েছে। নিচের দিকে তাকালে দেখা যায় সেখানে অনেক গরু চরছে, ঘোড়া চরছে।

পাইকদের মধ্য থেকে এখন সওয়ার তৈরি হয়েছে একদল। বমদুয়ার থেকে বেরিয়ে বনের মধ্য দিয়ে গচিহ্নিত পথটাও আর বনের সঙ্গে মিশে নেই। শুধু সংকেতে আর ইশারাতেই তাকে চিনতে হয় না। একটি সুগম চিহ্নিত সড়ক হয়ে সে গিয়ে মিশেছে দক্ষিণ দিকে বড় সড়কের সঙ্গে, উত্তর দিকে যেখানে শোভান খাঁ মারা পড়েছিল সেখানকার রাস্তার সঙ্গে। এই দিকটাই যেন মুখ পথ হয়েছে। এই পথ ধরেই যেতে হয় চন্দনগড়। এখানে একটা গম্বুজের মত আছে যেখানে পাইক মোতায়েন থাকে।

জঙ্গলগড়ে বন্দুক এসেছে, বারুদ এসেছে। ঘোড়া এসেছে, আস্তাবল হয়েছে। মানুষের জন্য ক্ষেত হয়েছে, খামার হয়েছে। রত্নাদেবী একজন বৈদ্য এনেছেন। রুক্মিণী রত্নাদেবীর অনুরোধে এবং গুরুত্ব বুঝে সপজ্বরের ওষুধের গাছ তাঁকে চিনিয়েছেন। বৈদ্য চিকিৎসা করে। ব্রাহ্মণ এসেছে, সে পূজা করে।

এ সবই হয়েছে এই আশ্চর্য মহিমময়ী রত্নাদেবীর বুদ্ধিতে, তাঁর চালনায়। দু বছর আগে যে দশমীর রাত্রিশেষে অর্জুন তার দল নিয়ে এঁদের উদ্ধার করে ডুলিতে করে জঙ্গলগড়ে নিয়ে আসে, তার তিন মাসের মধ্যেই দেশে এসেছিল বর্গী। বর্গীরা এসে আক্রমণ করেছিল চন্দন-গড়। এখান থেকে একশো পাইক নিয়ে ছুটে গিয়েছিল অর্জুন। কিন্তু সে কিছু করতে পারে নি; চন্দনগড় রক্ষা হয় নি। ব্যর্থ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছিল কিন্তু বর্গীরা তার পিছন ধরে জঙ্গলগড়ের সন্ধান জেনেছিল। ওদিকে চন্দনগড়ের অন্তঃপুরে সরন্দাজ খাঁর দুই ছেলে তন্ন তন্ন করে খুঁজে ভবানীবাঈ এবং হিরনবাঈ-এর সন্ধান না পেয়ে খুঁজেছিল কোথায় গেল তারা।

আবদুল শোভানের হত্যার পর খবরটা আর চাপা ছিল না। চারিদিকে জঙ্গলগড়ে অর্জুন সিং-এর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। আহত ডাকাতরা যারা কোনরকমে বেঁচেছিল তারা অর্জুন সিং নামটা শুনেছিল। অর্জুন সব আহতদের মেরে ফেলবার হুকুম দিয়েছিল গণ্ডারকে। গণ্ডার লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে মেরেছিল। তলোয়ার তার পছন্দ নয়। বাকি সে কাউকে রাখে নি বলেই তার ধারণা। কিন্তু প্রাণের ভয়ে জঙ্গলের মধ্যে কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করেও

দু-তিন জন মরার ভান করে বেঁচে ছিল। এবং যারা পালিয়েছিল তারাও কিছুটা খবর জেনেছিল

অর্জুন সিং, একটা আশ্চর্য কালো মেয়ে আর গণ্ডার। এই তিনটে কথা।

একজন বেহারা জঙ্গলগড়ের নাম শুনেছিল। কথাটি ছড়াতে বাকি থাকে নি। সরন্দাজ খাঁর ছেলেরা পিতৃহত্যার প্রতিহিংসায় এবং নারী লালসায় ঘুরছিল জঙ্গলগড়ের দিকে। অর্জুন একশো পাইকের মধ্যে ষাট জনকে নিয়ে জঙ্গলগড়ে ঢোকে। তখনও তার আক্ষেপ, তার বিষণ্ণতা, তার বেদনাকে ঠেলে ফেলতে পারে নি। মুহ্যমান হয়েই ছিল। চন্দনগড়, তার বাবার রাজ্য চন্দনগড়, তার চন্দনগড় বর্গীরা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়েছে। তোপ দেগে উড়িয়েছে। নরনারীর উপর অত্যাচারের বাকি রাখে নি। সে বাইরে থেকে গিয়ে বার বার পিছন দিক থেকে বর্গীদের আক্রমণ করেছে। বর্গী হত্যা করেছে তারা অনেক। তার দলের গেছে চল্লিশ জন, তারা মেরেছে অন্তত একশো জন। তাদের বন্দুক ছিল না। বন্দুক থাকলে আরও বেশি হত্যা করতে পারত। কিন্তু তাতেই বা কি হত? চন্দনগড় রাখবার শক্তি তো তার ছিল না। সে শঙ্করীমায়ের ভক্তির বলেও সন্তরপর হয় নি। সে নিজেও আহত হয়েছিল। একটা তীর বিঁধেছিল উরুতে। একটা চোট খেয়েছিল বাহুতে। অবশ্য একটা আঁচড়। সে মুহ্যমান হয়ে বসেছিল, সেবা করছিল অপরাজিতা। সে তখন অপরাজিতাই বলত ঝুমঝুমিকে। অবশ্য আদর করে ঝুমঝুম বলে ডাকা ছাড়ে নি।

এরই মধ্যে খবর এসেছিল। এনেছিল ছিদাম। সে প্রায় গাছে গাছে চলে এসেছে। মাটির উপর দিয়ে আসে নি। খবর এনেছিল, বর্গীরা চন্দনগড় থেকে মেদিনীপুরের দিকে চলে গেল বটে কিন্তু সরন্দাজ খাঁর ছেলেরা পাঁচশো সিপাহী নিয়ে ঘুরছে। ছত্রিশ জাতিরা জঙ্গলগড়ে আছে চন্দনগড়ের দুই বেটী। তার সঙ্গে আছে রত্নাবাঈ। এখন তারা তিন জনকেই নিয়ে যাবে আর জঙ্গলগড় ধ্বংস করে দেবে।

লাফ দিয়ে উঠে বেরিয়ে এসেছিল অর্জুন।

ঝুমঝুমি বলেছিল, আস্তে। এত জোরে না।

—জোরে না? ঝুমঝুমি?

—না। ঘায়ের মুখগুলা ফাটবেক। চল, আমি সাতে যাব।

—ঝুমঝুমি!

—আঁ!

—কি করব?

—গুরু যা বলেছে—লড়বে। তুমি ছত্রি।

বাইরে তখন কিষণজীর মন্দিরের সামনে সর্দাররা এসে জুটেছে। সর্দারের গদীর উপর গম্ভীর মুখে বসে আছে দাদো দলু। সামনে ভৈরব, গোবর্ধন, গণেশ। তাদের পরে আর কয়েকজন। বাকিরা সব ঘিরে উৎকণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

মন্দিরের দাওয়ায় বসে রুক্মিণী। তার পাশে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে রত্নাবাঈ। অর্জুনের রাণীমাতাজী। স্থির গম্ভীর। এসে অবধি তিনি নির্জনেই থাকতেন। ওই দুটি মেয়ে ছিল

আর ভবানীকে নিয়ে বসে থাকতেন, পুজো করতেন। রুক্মিণী এবং অর্জুন তাঁর কাছে যেত। অর্জুনের সঙ্গে যেত ঝুমঝুমি। এ কয়েক মাসে এই বিচিত্র মহিমময়ীকে মনে হত যেন আগুনের স্তূপ, পাতলা ছাইয়ের আবরণের মধ্যে ক্রমশ ঢেকে ফেলছেন নিজেকে। আগুনে ছাই আপনি পড়ে; ইনি যেন নিজে ইচ্ছে করে ফেলছেন। নিত্য সেই এক কথা। এবং সে এক কথা কেবল কটি কথা।

ভাল আছ রুক্মিণী? ভাল আছ বাবা? আমি? ভালই আছি বাবা। কোন দুঃখ নেই। বড় সম্মানে রেখেছ তোমরা। এত চুপচাপ? ভাবছি। কি ভাবছি? সবই কি নিজেই বুঝি? তবে ভাবছি নিজের জীবনের কথা। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতেন।

এই কথাকটি তিনি বলেছিলেন প্রথম দিন এসেই। তারপর সমানে বলেই যাচ্ছেন। সেদিন তাঁদের ডুলি নিয়ে অর্জুনের সাঙ্গোপাঙ্গরা যখন কিষণজীর মন্দিরের সামনে নামিয়েছিল, তখন মা, দাদো, অহল্যা দিদি, বিস্ফারিত দৃষ্টি ও ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে বলেছিল, ওরে লুচ্চা, বদমাশ, কুলাঙ্গার, এ কি করলি? কোন্ বড় ঘরনা মেয়েদের লুটে আনলি! এ কি মহাপাপ করলি রে তু!

ডুলির কাপড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছিলেন রত্নাদেবী; বলছিলেন, না, মহাপাপ ও করে নি রুক্মিণী, ও মহাপুণ্য করেছে। ওর বংশের নাম উজ্জ্বল করেছে। ছত্রির ছেলে ছত্রির কাজ করেছে। ও শয়তানের হাত থেকে ছত্রি মেয়ের ধরম রক্ষা করেছে। তার চেয়েও বড় পুণ্য রুক্মিণী, ও তার মাকে রক্ষা করেছে, বিধবা বহিনকে রক্ষা করেছে বিধর্মীর লাঞ্ছনার হাত থেকে।

ওদিক থেকে বিস্ফারিত চোখে এক পা এক পা করে যেন কোন ভয়ঙ্কর কিছুর দিকে এগিয়ে আসছিল দলু সর্দার। এদিকে স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়েছিল তার মা—রুক্মিণী দেবী।

ঈষৎ একটু তিলের মত এক তিল হাসি ফুটে উঠেছিল রত্নাবাঈ-এর ঠোঁটে মুখে। মনে হয়েছিল যেন ওই এক তিল হাসির মধ্যে কান্নার একটা সমুদ্র লুকানো আছে; সেটা অর্জুনের চোখেও ধরা পড়েছিল। তিনি বলেছিলেন—চিনতে পারছ সর্দার? রুক্মিণী? আমি চন্দনগড়ের রাজা মাধব সিং-এর বড় রাণী। তোমার সতীন। আমি রত্নাবাঈ।

অহল্যা কঠোরকণ্ঠে বলে উঠেছিল, তুই সর্বনাশী। তুই রাক্ষসী।

—হ্যাঁ, তা স্বীকার করছি আমি।

মা বলে উঠেছিল, পিসী! পিসী!

পিসী বারণ শুনবে কেন। সে বলেছিল, কি বলে এলি? কোন্ মুখে এলি? বেসরমী!

—পিসী! পিসী!

উনি হেসে বলেছিলেন, বেসরমী নই পিসী। রুক্মিণী তোমাকে পিসী বলছে, আমিও তোমাকে তাই বলছি। সরম আছে বলেই আজ এসেছি। অপরাধ স্বীকার করতে এসেছি। হ্যাঁ, অপরাধ আমার হয়েছে। কি বলে এসেছি? বলতে এসেছি রুক্মিণী বহিন, তুই আমার সতীন। তুই আমার বহিন, তুই সতী, রাজরাণী আমারই মতন। তোর গর্ভের সন্তান আমারও সন্তান। নইলে এই বিপদে রাজা মাধব সিং-এর চরম সর্বনাশের সময় সে এল

কেন, এল কোথা থেকে ? মন বললে পূর্বপুরুষ পাঠিয়েছে তার বংশধরকে। সে আমাকে মা বললে। আমি তাকে সব বললাম, জিজ্ঞাসা করলাম এর পরেও আমি তোমার মা ? সে বললে, হ্যাঁ, নিশ্চয়। মুখ উজ্জ্বল হল। সেই উজ্জ্বল মুখে এখানে এসেছি। বলতে এসেছি রুক্মিণী, তোর কাছে আমার অপরাধ হয়েছে। তোর ছেলে মাধব সিং-এর বংশের মান রেখেছে।

সকলে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। অর্জুন কাঁদতে শুরু করেছিল। তার সঙ্গে ঝুমঝুমিও। মা এসে তাঁর পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল।

দলু দুই হাত উপরে তুলে বলেছিল, জয় কিষণজী ! হে ভগবান !

রুক্মিণীকে হাত ধরে তুলে উনি বুকে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, এ ভবানী। মেঝলির ছোট বেটী। বিধবা। আর এ আমার ভাইঝি, সুচেতের বেটী হিঙ্গন। তারপর দলুকে বলেছিলেন, সর্দার, তোমাকে যদি বাপ বলি তুমি গোঁসা করবে ?

দলু সর্দার কেঁদে ফেলেছিল। আবার হাত তুলে বলেছিল, ধন্য, আমি ধন্য হয়ে গেলাম মায়ী। আমার হারানো ইজ্জত আবার ফিরে পেলাম। হায় হায়, আজ যদি এখানে বাবুন থাকত তবে তোমাদিগে সাক্ষী করে আমি ফের পৈতে নিতাম।

রাণী রত্নাবাঈ বলেছিলেন, তার জন্যে আক্ষেপ কর না বাপ, হবে। সময় যখন হবে তখন সুতা ছাড়ার মত সুতা ফেরা গাঁয়ের প্রতিষ্ঠা হবে। কখনও না কখনও হবেই এ তুমি জেনো। বলে তিনি ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলেন।

বাস্। ওই পর্যন্ত। আর না। তার পর থেকে ঘরেই আছেন। ওই কথা। তবে বলে রেখেছেন, হাঙ্গামা মিটলেই চলে যাবেন পুরী, জগন্নাথ-ধাম।

আর একদিন কথা বলেছিলেন। যেদিন অর্জুন বর্গীদের চন্দনগড় আক্রমণের সংবাদ পেয়ে একশো পাইক নিয়ে লড়তে যায় সবার অমতে সেইদিন। অমত ছিল দলুর, ভৈরবের, গোবর্ধনের, গণেশের প্রবীণদের সকলেরই। ছিল না মায়ের। আর ছিল না অল্পবয়সী জোয়ানদের।

ঝুমঝুমি তার মুখে চুমু খেয়ে গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে বলেছিল, যাও। আমি শঙ্করীমায়ের কবচটা বুকে ধরে পড়ে রইলাম। যাও।

সেদিন রত্নাবাঈ তাকে বুকে চেপে ধরে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, ধন্য রুক্মিণী। ধন্য রাজা মাধব সিং। ধন্য আমি। গর্ভে না ধরেও আমি তোর মা। তারপর একখানা ছোরা তার হাতে দিয়ে বলে ছিলেন, তোর বাপের ছোরা। বলেই আবার ঘরে ঢুকেছিলেন।

আহত হয়ে ফেরে যেদিন অর্জুন ফিরে আসে সেদিন দেখতে এসেছিলেন। আশীর্বাদ করে গিয়েছিলেন। চন্দনগড়ের অবস্থার কথা শুনে কেঁদেছিলেন।

হঠাৎ বেরিয়ে এলেন ওই দিন। সরদাজ খাঁয়ের ছেলেরা পাঁচশো সিপাহী নিয়ে আক্রমণ করতে আসছে খবর যেদিন এল সেইদিন।

এসে দাঁড়িয়ে বললেন, সর্দার !

নীরব সকলে তার দিকে তাকালে। সবার মুখে বিরক্তি। কারণ সকল উপদ্রবের মূল এরাই। এদের জন্যই আসছে সরন্দাজ খাঁর ছেলেরা।

তিনি বলেছিলেন, জানি, তোমাদের এ বিপদ আমাদের জন্য। এক কাজ কর। ডুলি করে আমাদের পাঠিয়ে দাও। আমরা এবার তৈরি হয়ে যাব। আমি ঝুমঝুমির কাছে শুনেছি, তার বাপের কাছে খুব চড়া বিষ আছে। সেই বিষ খেয়ে চড়ব ডুলিতে।

চিৎকার করে উঠেছিল অর্জুন, না না—কভি না।

রুক্মিণী এসে তাঁর হাত ধরে বলেছিল, বিষ যদি খেতে হয় তবে ডুলিতে চেপে তোমরা তিনজনে খাবে কেন! ঘরে কিষণজীর মন্দিরে তাঁর সামনে বসে তোমাদের সঙ্গে আমিও যাব। বলব, কিষণজী, তুমি বিগ্রহ। আমার বাপ, আমার ভাইরা অপারগ—

দলু উঠে বুক চাপড়ে বলে উঠে ছল, আমার মাথায় বজ্রাঘাত কর হে কিষণজী। আমার মাথা তোমার চক্র দিয়ে কেটে ফেল। এই কথা আমার সেই বেটী বলে যার জন্যে আজ বিষ খায়—

হা হা করে কেঁদে উঠেছিল সে।

—বাবা বাবা! পিতাজী! বলেছিলেন রত্নাবাঈ।

অর্জুন ছুটে এসে দাদাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, কেউ না লড়ে আমরা দুজন লড়ব।

অধীর ভৈরব উঠে হাত জোড় করে বলেছিল, আমরা তো না বলি নাই। কিন্তুক আমরা তো কি বলতে হয় জানি না। লড়াইয়ের সময় চেঁচাতে জানি।

দলু বলেছিল, এবার বিলকুল তৈরি হয়ে যা। বিলকুল। এখন থেকে।

রত্নাবাঈ বলেছিলেন, দাঁড়াও পিতাজী। বলে ডেকেছিলেন, ভবানী, নিয়ে আয় ও পেটিটা।

একটি পেটি এনে নামিয়ে দিয়েছিল ভবানী। পেটি খুলতে বেরিয়েছিল—সোনার, সিক্কা আর ওড়োয়া গহনা জহরত।

রত্নাবাঈ বলেছিলেন, ধান চাল গঁহ সোয়ার যা মেলে কাছে পিঠে যত পার কিনে আন। তিনগুণ চারগুণ দশগুণ। যদি সিক্কা দামের জিনিসে মোহরের দাম দিতে হয় তবে তাও দিয়ে মাল কিনে এনে বোঝাই কর। খবরদার, লুঠ করো না। আশেপাশের লোক যেন না চটে। আর কিনে আন তীরের ফলা, সড়কির ফলা, তলোয়ার। না হয়তো পাশের গাঁও থেকে লোহা আর লোহার জন কতককে এখানে আন। মুলুকে আসে ভাল না আসে জবরদস্তি করে আন, চুরি করে আন। কামারশাল পেতে দাও।

—ঠিক বলছে মা। রাজবুদ্ধি।

—যদি হুকুম দাও বাপ, তবে দেখি নিজে সমস্ত পাহাড় ঘুরে। রাজপুতের মেয়ে লড়াই বুঝি, জানি। আমি কিছু বুদ্ধি দিতে পারি।

—নিশ্চয়।

সমস্ত দেখে ফেরবার সময় হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, এখানে নিমগাছ তো অনেক সর্দার। এর বিচি কি হয়?

—জড়ো করে মা তেল হয়।

—যত পার বিচি যোগাড় করে পেষাই করাও। বর্গী যে মুখে হানা দেবে সেই মুখে পাথর গড়াবে। সঙ্গে সঙ্গে গরম তেল গড়াবে। আর ওই যমদুয়ারের মুখ বিলকুল বন্ধ করে দাও।

—বন্ধ করে দেব!

—হাঁ, নিচেটা ভরে থাক জলে। দুশমন ঢুকলে যেন নিচে দাঁড়াবার জায়গা না পায়। পাথর ঢেলে ঢেলে বন্ধ করে দাও। জল আটকালে বাইরে নদীতে জল থাকবে না। বনে জল পাবে আর কোন্ পাহাড়ে ভীমরুল আছে শুনেছি? সেই পাহাড়ের মুখটাতে একটা ফটকের মতন গড়ো। যেন বাইরে থেকে মনে হয় সেটাই ঢুকবার জায়গা। বুঝেছ? ভীমরুলরা আমাদের হয়ে লড়বে।

—সাবাস, সাবাস মা! বহুত সাবাস! তুমি রাজরাণী, রাজমাতা।

* * *

কৌশলটা ব্যর্থ হয় নি। সরদাজ খাঁর ছেলের দল ঢুকতে পারে নি। একদিন রত্নাদেবী পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ চালনা করেছিলেন। একদিন পাঠানকে এই মুখে ইচ্ছে করে ঢুকতে দিয়েছিলেন। খুব উৎসাহের সঙ্গে তারা যেমনি দুই পাহাড়ের জোড়ের মাথায় উঠেছিল, অমনি ঠিক সেই মুহূর্তে তীরের পর তীর নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ভীমরুলের চাকের দিকে। বাস্, তারপর আর দেখতে হয় নি। সেখানে ছত্রিশ জাতিয়াদের কেউ সামনে ছিল না। আর যারা ছিল তারা মেখেছিল নিমের তেল আর সেই পাতার বাটা। তৈরি করেছিল ঝুমঝুমি অন্ত মেয়েদের নিয়ে। সেইদিন যে পাঠানরা পালিয়েছিল সেই বোধ হয় শেষ পালানো। ওদিকে খবর এসেছিল মেদিনীপুর পর্যন্ত হটে এসে বর্গীরা আবার উড়িষ্যা পালাচ্ছে। বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দী আবার এসে পৌঁছেছেন খড়্গপুরে। মীর হবিব, জানোজী, মুস্তাফা খাঁ মেদিনীপুর থেকে ছাউনি তুলে দ্রুত হটছে। সরদাজ খাঁর ছেলেরা যদি এখনও ওই ঔরতের মামলা নিয়ে কটা শুকনো পাহাড় ঘিরে বসে থাকে তবে তার দায় তাদের।

পাঠানরাও বিরক্ত হয়েছিল। তারা না পেয়েছিল লুটের মত গ্রাম শহর, না পাচ্ছিল ভাল জল। তার উপর ভীমরুলের সঙ্গে কে লড়াই করতে পারে? মানুষে পারে না।

অগত্যা পালিয়েছিল সরদাজ খাঁর ছেলেরা।

বারো পাহাড়ের মাথা থেকে বারো পাহাড়ের বাইরে এসে বনের গাছে গাছে ফিরে যখন আর একটিও পাঠানকে দেখতে পায় নি, তখন সকলে এসে রত্নাদেবীর চরণে লুটিয়ে পড়েছিল। রত্নাদেবী যিনি আসা অবধি হাসেন নি, তিনি সেদিন হেসেছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকজনকে একসিক্কা পুরস্কার দিয়েছিলেন। সারা পাইকমহলে আনন্দের অবধি ছিল না। হাট থেকে কাপড় আনিয়ে মেয়েদের দিয়েছিলেন। দেন নি শুধু দাদোকে কিছু। দাদোর তখন অসুখ। জখম হয়েছিল দাদো। দাদোকে দেখতে গিয়ে বলেছিলেন, প্রণাম তোমাকে পিতাজী।

দাদো বলেছিল, আমি নিশ্চিন্ত মায়ী। আমি গেলে রুক্মিণী আর অর্জুনকে দেখবার

লোক রইল। তুমি প্রণাম করলে, আমি ধন্য হলাম। আজ থেকে আমি শোলাঙ্কী রাজপুত।

সবশেষে রত্নাদেবী অর্জুনকে রুক্মিণীর কাছে বসিয়ে বলেছিলেন, তুমি আজ থেকে শুধু অর্জুন সিং নও—কুমার অর্জুন সিং। রাজা মাধব সিং-এর ছেলে। সিংহের বাচ্চা সিংহ। তোমাকে এবার চন্দনগড়ের গদীতে বসতে হবে। নবাব বাহাদুরের কাছে আমি পাঠাব তোমার হয়ে দরখাস্ত। তার আগে তোমাকে পরিচয় করতে হবে নবাব সাহেবের সঙ্গে। তা ছাড়া বেটা তোমার বাপকে যে ষড়যন্ত্র করে মেরেছে তার একজন সুচেৎ সিং, আমার ভাই, সে মরে তার মাসুল দিয়েছে। এখন আসল শয়তান বেঁচে—মীর হবিব। বেটা!

—মাতাজী!

—বল রুক্মিণী, বল বহিন।

—তুমি বল দিদি—

—বেশ, আমি বলছি। বলছি মীর হবিবকে সাজা তোমাকে দিতে হবে। রাজা মাধব সিং-এর খুনের বদলা নিতে হবে। বল, তার খুন এনে দেবে আমাদের দুই বহিনকে? তোমাকে চন্দনগড়ের গদীতে বসিয়ে আমরা দু বহিন তোমাদের দু হাত তুলে আশীষ করব। তোমার পুরস্কার তোলা রইল। দেব আমি।

অর্জুন উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, যাব আমি মাতাজী, আমি যাব।

কায়ার সঙ্গে ছায়ার মত ঝুমঝুমি ছিল পাশে দাঁড়িয়ে, সে কেঁপে উঠেছিল।

রুক্মিণী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, না না না। ঝুমঝুম, কিসের ভয়? আয়, আমার কাছে আয়।

মাতাজী বলেছিলেন, শুনেছি গুরু বলেছেন তুই নায়িকা। সে যে শঙ্করীমায়ের জয়া বিজয়া রে। আঁ! নায়িকা, তুই ভয় খেলে চলবে কেন? আয় শোন্, এই নে।

নিজের গলা থেকে খুলে লাল প্রবালের মালা পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আজ ভবানী বেটী তোর কেশবন্ধন করে দেবে, সাজিয়ে দেবে। সারা রাত আনন্দ করবি। বলবি অর্জুনকে, লড়াই ফতে করে নবাব সাহেবের কাছ থেকে মুক্তাহার এনে দেবে তোকে। আঁ! তুই নায়িকা, রাণী নোস। তুই নাচবি, নাচাবি নায়ককে, তবে তো রে বেটী!

অভিভূত হয়ে গিয়েছিল অর্জুন, ঝুমঝুমি দুজনেই।

রাত্রে কিন্তু ঝুমঝুমি বলেছিল, জান সিং, মাতাজীকে কেমন ভয় করছেক গো!

—হাঁ। মহিমা কেমন দেখছিস না!

পরদিন বাছা বাছা পঞ্চাশজন পাইক নিয়ে অর্জুন রওনা হয়ে গিয়েছিল উড়িষ্যার পথে। নবাব চলেছেন বর্গীদের পিছন পিছন। নিজে হাতে কলম ধরে মাতাজী এক আর্জি তৈরি করে দিয়েছিলেন। মহামহিম মহিমার্ণব সুজাউল মুল্ক হেসামউদ্দৌলা বাংলা বিহার উড়িষ্যার মালেক নবাব আলিবর্দী খাঁ বাহাদুর বরাবরেষু—

সে আর্জির বাঁধুনি কি! তিনি যখন পড়ে শুনিয়েছিলেন তখন রোগশয্যায় শুয়ে দলু সর্দার বার বার সাবাস সাবাস করে সারা হয়েছিল। পাইক সর্দারেরা অবাক হয়েছিল।

আর্জিতে নবাবী ফৌজে অর্জুনের চাকরি ভিক্ষা করেই ক্ষান্ত হন নি এই সুচতুর মাতাজী, দাবি করেছিলেন চন্দনগড়ের গদী তাঁর সন্তান এই দরখাস্তবাহক পুত্র কুমার অর্জুন সিং-এর জন্য। সঙ্গে দিয়েছিলেন রেশমী রুমাল আর দিয়েছিলেন পাঁচখানি মোহর। নবাব সাহেবের সামনে কুর্ণিশ করে হাঁটু গেড়ে বসে কেমন করে নজরানা দিতে হবে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

যাবার সময় অর্জুন বলেছিল, মাতাজী, দাদো রইল, মা রইল, পাইকরা রইল, তুমি দেখো।

—নিশ্চিন্ত হও।

অর্জুন মা রুক্মিণীকে বলেছিল, মা!

—অর্জুন!

—আসি মা।

একটু ইতস্তত করে বলেছিল, ঝুমঝুমিকে দেখো মা। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল রুক্মিণী, কেমন শিউরে উঠেছিল ঝুমঝুমি, অর্জুনেরও বিস্ময়ের শেষ ছিল না নিজের কথাগুলি শুনে। সে যেন দোসরা মানুষ হয়ে গেছে। কুমার অর্জুন সিং।

রুক্মিণী উত্তর দেয় নি। দিয়েছিলেন রত্নাদেবী। বলেছিলেন, কুমার, তোমার নায়িকা সে আমাদের খুব আদরের। শুধু দেখা কি—আমরা সবাই আদর দিয়ে ভুলিয়ে রাখব ওকে। ওকে চন্দনগড়ের রাজা-বাহাদুরের নায়িকা করে গড়ে রেখে দেব। দেখবে এসে।

তারপর থেকে জঙ্গলগড়ের এই পরিবর্তন করিয়েছেন রত্নাদেবী। দলু সর্দার মারা গেছে। সর্দার রত্নাদেবীকে ডেকে বলেছিল, আমি নিশ্চিন্ত মায়ী। আমি নিশ্চিন্ত।

রাণীজী ছত্রির মত সৎকার করে তার শ্রাদ্ধ করিয়েছিলেন। তারপর গোবর্ধন আর গণেশকে নিয়ে এই জঙ্গলগড়কে গড়েছেন। সুচেত সিং-এর মৃত্যুর পর চন্দনগড় নবাবী শাসনে মেদিনীপুরের ফৌজদারের অধীন; তবুও সেখানকার ছত্রিরা, পাইকরা রাণীমাতাজীর কাছে আসে যায়। সেখান থেকে রাজমিস্ত্রী ছুতোরমিস্ত্রী আনিয়ে এসব গড়ে তুলেছেন।

উড়িষ্যা থেকে পাইকরা গিয়ে সংবাদ আনে। অর্জুন সিং নবাবের ফৌজে নাম করেছে। তার পদ হয়েছে। নবাব একবারের যুদ্ধে তার বীরত্বের জন্যে তলোয়ার দিয়েছেন। পোশাক দিয়েছেন। সে এখন ঘোড়া কিনেছে। ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ করে। মীর হবিব হটছে—হটছে—হটছে। অর্জুন সিং-এর আপসোস এখনও পিতৃহত্যার শোধ হয় নি। মীর হবিব এখনও মরে নি। একবার খবর এল, ভৈরব মরেছে। ভৈরব অর্জুনের সঙ্গে গিয়েছিল। রাণীমাতাজী ভৈরবের ছেলে গোরাচাঁদকে সর্দারী দিয়েছেন। তলোয়ার দিয়েছেন। টাকাও দিয়েছেন—একশো টাকার তোড়া। গোটা জঙ্গলগড় অন্যরকম, শুধু বাইরের চেহারাতেই হয় হয় নি। ভিতরের চেহারাতেও পাল্টেছে। আর ছোকরারা মদ খেয়ে বারো পাহাড়ের এলাকায় আসে না। সকালে সন্ধ্যায় মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজে। রাত্রে আলো জ্বলে।

আগের মত বারো পাহাড়ে অন্ধকার নিরন্ধ্র নয়; সে অন্ধকার দলবদ্ধ তরুণ পাইকদের স্খলিত চিৎকারে চমকায় না। ছত্রিশ জাতিরা আদিবাসীরা নেমে গেছে নিচে। সমতলের কাছাকাছি তাদেরও বেশ একটি পল্লী তৈরি হয়েছে। তাদের মেয়েরা আর অল্পবাসা নয়—তাদের মধ্য থেকে উপপত্নী সংগ্রহ এখনও করে পাইকরা, কিন্তু তারা সে উদ্দাম বেদিয়ার মেয়ে নয়।

ঝুমঝুমি কেশ বন্ধন করে মুখে সরময়দা মেখে প্রসাধন করে। বেশ-বাস তার কাচুলি, ওড়না, ঘাঘরি। হাতে রূপার কঙ্কন, কোমরে রূপার চন্দ্রহার। তাকে ভবানী তরিবৎ সহবৎ শেখায়। কুমার অর্জুন সিং-এর নায়িকা সে। মহাভারতের রামায়ণের গল্প শোনায় তাকে।

কিন্তু আশ্চর্য, আজ সে নেই।

গতকাল খবর এসেছে মীর হবিব নেই, সে খতম। কুমার অর্জুন সিং একখানা রুমালে তার রক্ত মাখিয়ে মাথার পাগড়ীর মধ্যে নিয়ে ফিরছে বারো পাহাড় ছত্রিশ জাতিরা জঙ্গলগড়ে। ফিরবে আট দশ দিনের মধ্যে। রাণীমাতাজী বারো পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় পতাকা উড়িয়ে দিয়ে জঙ্গলগড়ের বারো পাহাড়কে সাজাচ্ছেন। পাইকদের পাগড়ী কুর্তা বিলকুল নতুন হয়েছে। শালগাছের ডালে পাতায় ফটক্ হচ্ছে। স্থির হয়েছে কুমার এখানে যেদিন আসবেন তার তিনদিন পরই সব রওনা হবে চন্দনগড়।

চন্দনগড়ে অর্জুন সিং-এর দাবি মেনে নিয়েছেন নবাব আলিবর্দী খাঁ। ফরমান দিয়েছেন মেদিনীপুরের ফৌজদারকে, হুকুম দিয়েছেন চন্দনগড়ের দখল রাজা মাধব সিং-এর ছেলে অর্জুন সিংকে দেবার জন্যে। অর্জুন সিংকে রাজা খেতাব দিয়েছেন। অর্জুন সিং বছর বছর নবাবী খাজনার তঙ্কা আমানত করবেন মুর্শিদাবাদের খাজাঞ্চীখানায়।

তিন মাস পূর্বে এসেছে ফরমান। দখল পাওয়া গেছে। নবাব আলিবর্দী ফিরে গেছেন মুর্শিদাবাদ। মীর হবিব নবাবের কাছে দাঁতে খড় নিয়ে মাফ চেয়ে তাঁর হাত থেকে বেঁচে উড়িষ্যায় রয়েছে। সেই দুঃখে অর্জুন ফরমান পেয়েও ফেরে নি। সে ঘুরছিল, তীর্থের অজুহাত করে ফিরছিল। সংকল্প সিদ্ধ না হলে ফিরবে না জানিয়েছিল লোক মারফত। বারণ করেছিল ভয় করতে। প্রকাশ করতেও নিষেধ করেছিল। রাণী জানিয়েছিলেন শুধু রুক্মিণীকে। বলেছিলেন, বীরমাতা তুমি। বুক বাঁধ।

—দিদি, আজ বাইশ বছর বুক বেঁধে আছে রুক্মিণী। জীবনের বাকি কটা দিনও সে তা পারবে।

চঞ্চল হয়েছিল ঝুমঝুমি। সে বার বার জিজ্ঞাসা করেছিল, মা, কেন ফিরল না সে?

রত্নাদেবী বলেছিলেন, চুপ কর ঝুমঝুম। তার বাপের মৃত্যুর শোধ নিতে পারে নি। ছত্রির ছেলে সে।

সে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলে তাঁর দিকে।

—মহাভারতের গল্প ভবানী তোকে শোনায় ঝুমঝুম?

—হাঁ মা।

—তবে সেই। ছত্রির কসম—প্রতিজ্ঞা তাই।

পরের দিন সন্ধ্যায় রাণীমাতাজী দরবার করেছিলেন। ঘোড়সওয়ার গিয়েছিল চন্দনগড়। সেখান থেকে কজন ছত্রি সর্দার এসেছিলেন। আর এসেছিলেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত, কয়েকজন মাহিষ্য সদ্‌গোপ জোতদার।

অনেক মশাল জেলে চারিপাশে খুঁটো পুঁতে তার সঙ্গে বেঁধে দরবার করেছিলেন রাণীমাতাজী। পাশে ছিল মাতাজী রুক্মিণী। ভবানী, হিজল ছিল পিছনে। একপাশে ঝুমঝুমিও বসেছিল। ভয় করছিল তার। এসব সে জানত না, বুঝত না। আজ বুঝতে হয়েছে, বুঝতে হচ্ছে, কিন্তু ভয় করছে। তার নিজেকে দেখেই কেমন যেন ভয় করে। তার মা বাপ, তার আত্মীয়স্বজন তার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। আবার রাণীমাতাজী, ভবানীবাঈ, হিজলবাঈও তার থেকে অনেক দূরে ও পরে। মাতাজীও ওদের সঙ্গেই রয়েছেন। শুধু সে একা। একেবারে একা। রুক্মিণী মাতাজী ওদের কাছ থেকে মধ্যে মধ্যে নেমে এসে তাকে সমাদর করেন। কিন্তু সে কতক্ষণ? সে নিঃসঙ্গ। তার পরিচর্যার জন্ত একটি বেদিয়া মেয়ে দাসী আছে। তার স্বজাতি। কিন্তু সে একা—সে একা হয়ে গেছে। ঝুমঝুমিকে ভয় করে।

মেয়েটাও অর্জুন অর্জুন করে কাঁদে। ভবানী তাকে মহাভারতের অর্জুনের গল্প বলে। বলে, অর্জুনের বনবাসের কথা। তার বিয়ের কথা। উলুপী, চিত্রাঙ্গদা, কত কত বিবাহ! তারা সারাজীবন অর্জুনের জন্ত কেঁদে কাটিয়েছে। তাকেও কি তেমনি করে—? সে কাঁদে, আবার নিজেই সান্ত্বনা খুঁজে নেয়। না না, তার অর্জুন তেমন নয়। সে আসবে। কবে আসবে? তবু ভয় করে। সেই ভয় নিয়েই সে সেদিনও দরবারে বসেছিল।

রাণীমাতাজী বসে আদেশ দিয়েছিলেন বাজী পোড়াবার। আতসবাজী এসেছিল চন্দনগড় থেকে। বারো পাহাড়ের আকাশ আতসবাজীর ফুলঝুরিতে ভরে গিয়েছিল। বোম ফুটেছিল; ত্রস্ত পাখির ডাকে বন মুখরিত হয়ে উঠেছিল সেই রাত্রে। দূরে উঠেছিল একটা বাঘের গর্জন। হুঙ্কার দিয়ে সেটা পালিয়েছিল এক লাফ দিয়ে। সেটা বুঝতে কারুর কষ্ট হয় নি। সকলে হো হো করে হেসে উঠেছিল।

রাণীমাতাজী উঠে দাঁড়াতেই সকলে থেমে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, ভগবান রাধামাধব, কিষণজীর করুণা—আর সুবিচারক মেহেরবান নবাব আলিবর্দীর মেহেরবাণী। চন্দনগড় আবার ফিরে এল রাজা মাধব সিং-এর পুত্রের হাতে। কুমার অর্জুন সিং বাহাদুর। আমার ভাই হলেও সুচেত সিং তার বাপের শত্রু ছিল। কেমন করে আমাকে প্রতারিত করে সিংহাসন থেকে নামাবার বদলে মীর হবিবকে দিয়ে খুন করিয়েছিল, নিজে গদী দখল করেছিল সে সবাই জানে। আমার ভুল হয়েছিল—ছত্রিদের ভুল হয়েছিল রাণী রুক্মিণীকে রাণী বলে স্বীকার না করা। আমি স্বীকার করছি। অর্জুন সেই রাণী রুক্মিণীর ছেলে। সেই বিপদের দিনে শুধু তার মা আমাকে, তার বহিন ভবানীকেই রক্ষা করে নি, সুচেতের বেটী হিজলকেও রক্ষা করেছে। ছত্রির কাজ করছে। আমাদের জন্তে পাঠানদের সঙ্গে লড়েছে। শুধু সে নয়, এখানকার পাইকরা সবাই। চন্দনগড় রাখতেও সে গিয়েছিল। কিন্তু পঞ্চপালের

মত বর্গীর সঙ্গে পারে নি তখন। তার শোধ সে নিয়েছে। নবাবের ফৌজে যোগ দিয়ে সে বর্গী পাঠানদের অনেক রক্ত ঝরিয়েছে। ভগবান তার পুরস্কার দিয়েছেন। দেশের নবাব তাকে চন্দনগড়ে জায়গীর মঞ্জুর করে রাজা খেতাব দিয়ে ফরমান দিয়েছেন। তার কল্যাণে চন্দনগড় পূর্বের মত আপনা রাজ্য হয়ে গেল। কুমার অর্জুন এখনও ফেরে নি। সে তীরথ ঘুরছে। নবাবী খেলাত পেয়েছে। এবার পিতৃঋণ শোধ করে পিতৃপ্রসাদ দেবতার প্রসাদ নিয়ে ফিরবে। কুমার ফিরলে আমি তাকে নিয়ে চন্দনগড়ে যাব। সে গদীতে বসবে। তার আগে আমি তাকে দেব মায়ের আশীষ। এই কন্যা—সুচেত সিং-এর কন্যা হিঙ্গনকে তার হাতে দিয়ে আশীষ করব। রাজার শাদি আর অভিষেক একসঙ্গে হবে।

সকলে সমস্বরে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠেছিল। রাণীমাতাজী আবার বলেছিলেন, এখানকার পাইকরা চন্দনগড়ে বসতের জমি পাবে। পাইকান ক্ষেত পাবে। এখানেও থাকবে তারা। ছত্রিশ জাতিরা জঙ্গলগড়ে রাজাবাহাদুরের অবসর যাপনের ঠাঁই হবে।

আবার জয়ধ্বনি উঠেছিল। ধন্য ধন্য করেছিল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা।

শুধু নিজেদের অজ্ঞাতসারে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চলে গিয়েছিল ছত্রিশ জাতিরা বেদিয়ারা। আর পাথর হয়ে গিয়েছিল ঝুমঝুমি।

দরবার ভেঙে গেলেও সে বসেছিল। রুক্মিণী তার গায়ে হাত দিয়ে ডেকেছিলেন, ঝুমঝুমি!

—মা!

—চল। ওঠ।

উঠেছিল সে নীরবেই, সঙ্গে চলেছিলও নীরবে। রুক্মিণী বলেছিলেন, তুই যেমন আছিস তেমনি থাকবি ঝুমঝুমি। সে তোকে ভালবাসে।

সে প্রশ্ন করেছিল, অর্জুন?

—হাঁ। ভালবাসে কিনা তুই বল্।

—হাঁ মা। তারপর চুপ হয়ে গিয়েছিল। তার অন্তরের কথা রুক্মিণীর বুঝতে কষ্ট হয় নি। তাঁর কাছে তো দুর্বোধ্য নয়। কিন্তু কি করবেন? একটি মানুষ একটি মানুষী সারাজীবন এক হয়ে থাকা সে কোথায়। ছত্রি রাজা। রাম কোথায়? সীতা এখনও আছে। হায় শবরী সীতা!

ঝুমঝুমি নীরবেই গিয়ে বসেছিল মন্দিরে আরতির সময়। মধ্যে মধ্যে চোখ মুছছিল। রুক্মিণী লক্ষ্য রেখেছিলেন তার উপর। আরতি শেষ হতে কিষণজীকে প্রণাম করে তাঁদের প্রণাম করে তাঁর নির্দিষ্ট ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন।

পরদিন সকালে ঝুমঝুমিকে খুঁজে কেউ পায় নি। তার বেশভূষা সব পড়ে ছিল। কিন্তু তাকে পাওয়া যায় নি। খোঁজ অনেক করেছিলেন রাণীমাতাজী। কিন্তু কোন খোঁজ মেলে নি। রুক্মিণী কোন কথা বলেন নি। তিনি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

কয়েকদিন পাইক মহলে কথা হয়েছিল। কথা বুঝতে কারুর বাকি থাকে নি। তারা কেউ সমর্থন করতে পারে নি ঝুমঝুমিকে। ছত্রিশ জাতিরা বেদিয়ারাও না।

তিন মাস পর। ফিরছেন কুমার অর্জুন সিং। মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে তাঁর। বর্গীরা সন্ধি করেছিল নবাবের সঙ্গে। উড়িষ্যা ছেড়ে দিয়েছিল নবাবকে, কিন্তু চৌথ পেয়েছিল। মীর হবিব তাঁর স্বভাবমত এবার দল বদল করে আবার হয়েছিলেন নবাবের চাকর। কিন্তু বর্গীরা তাঁকে ক্ষমা করে নি। জানোজী কটকের প্রান্তে ছাউনি ফেলে সুযোগ খুঁজছিলেন। অর্জুন তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। একদিন জানোজী মীর হবিবকে নিমন্ত্রণ করে এনে হিসাবনিকাশের কথা পেড়েছিলেন। তারপর বর্গীরা করেছিল আক্রমণ। মীর হবিব তাঁর দল নিয়ে লড়াই করে পারেননি। মরতে তাঁকে হয়েছিল। কুমার অর্জুনের তলোয়ার আরও কয়েক জনের সঙ্গে বিদ্ধ হয়েছিল মীর হবিবের বুকে। তাতেই ভিজিয়ে নিয়েছিল সে তার রুমাল।

সেই রুমাল মাথার পাগড়ীতে বয়ে নিয়ে ফিরল কুমার অর্জুন। সঙ্গে তার চল্লিশজন পাইক। ঘোড়ার উপর চড়ে ফিরছে। সঙ্গে আসছে এক ডুলি।

শঙ্খধ্বনির মধ্যে কোলাহলের মধ্যেও কথাটি প্রশ্নের সুরে ধ্বনিত হল—ডুলি?

ছত্রি রাজপুত! বীর! কোথা থেকে কোন বিমুগ্ধাকে নিয়ে এসেছে! আশ্চর্য কি!

রাণীমাতাজী সবিস্ময়ে তাকিয়েছিলেন দরবার মঞ্চে দাঁড়িয়ে। তাঁর পাশে রুক্মিণী। তিনিও বিস্মিতা।

অর্জুন নেমে এসে প্রণাম করে রক্তাক্ত রুমালখানা নামিয়ে দিয়ে বললে, এই নাও মাতাজী, মীর হবিবের রক্ত।

গম্ভীরভাবে রত্নাদেবী বললেন, দীর্ঘজীবী হও। তোমার সুযশে চন্দনগড় দেশ মুখরিত হোক। কিন্তু ডুলিতে কে? কাকে নিয়ে এলে অর্জুন? আমি যে হিঙ্গনের সঙ্গে তোমার বিবাহের দিন স্থির করেছি।

—সে তো হয় না রাণীমাতাজী। আমি জীবনে একটি মেয়েকেই ভালবেসেছি। তাকেই জগন্নাথ সাক্ষী করে বিবাহ করেছি। ঝুমঝুমি নাম-প্রণাম কর।

সলজ্জিতা বধূবেশিনী কৃষ্ণাঙ্গী কন্যা নেমে এসে প্রণতা হল।

—ঝুমঝুমি?

—হ্যাঁ রাণীমাতাজী। অসীম ওর সাহস। ভয়ডর নেই। আমার জন্যে পাগল হয়ে রাত্রে জঙ্গলগড় থেকে বেরিয়ে ভিক্ষা করতে করতে গিয়েছিল পুরী। সেখানেই ছিল। অসীম সাহসিনী ও। পুরী থেকে কটকে গিয়ে আমার কাছে গিয়েছিল। আমার বুকে পড়ে কি কান্না! বল, তুমি শুধু আমার, শুধু আমার। আমি তো তাই। আমি আর কারু হতে পারব না মাতাজী। আমি ওকে বিবাহ করেছি জগন্নাথের সামনে। তাঁকে সাক্ষী করে। ভাগ্যক্রমে শঙ্করীপুরের মায়ের গুরুকে সেখানে পেয়েছিলাম। তিনি বিবাহ দিয়েছেন। এই পাইকরা সাক্ষী। তিনি বললেন, তোমার মায়ের সঙ্গে তোমার বাবার বিবাহে আমি মন্ত্র পড়েছিলাম। তোমার বিবাহেও পড়ছি। বললেন, তোমার জাত যায় না অর্জুন।

—কিন্তু চন্দনগড়ের ছত্রিরা প্রজারা তো এ সহ্য করবে না।

—হবে না মাতাজী সহ্য করতে। চন্দনগড়ের গদীতে বসবে আমার বড় বহিনের ছেলে। রাজা মাধব সিং-এর দৌহিত্র। হিঙ্গনকে তার হাতে দাও মা।

—ভাল। সেই বসবে। কিন্তু হিঙ্গন—। হাসলেন রাণীমাতাজী। বললেন, আমারই ভুল। হিঙ্গনকে যে জগন্নাথের কাছে যেতেই হবে। আমি যে চন্দনগড় থেকে বেরুবার সময় তাঁর নাম করেই ওকে বলেছিলাম—চল্, তাঁর হাতে তোকে দিয়ে আসি। তাই হবে।

রুক্মিণী নেমে এসে কৃষ্ণাজী বেদিয়ার মেয়েকে বুকে টেনেই নিলেন না, সকলের সমক্ষে তার কপালে চুম্বন দিয়ে চোখ বুঝলেন। দুটি জলের ধারা তাঁর চোখ থেকে নেমে এসে ঝড়ে পড়ল বধূর মাথার উপর।